সতীপীঠ বহুলা

অসীম কুমার রায়

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর শরণম্॥

ভারতবর্ষের একান্নপীঠের সতীপীঠ “বহুলা” দেবী কেতুগ্রামে অবস্থিত।

॥দ্বিতীয় ভাগ॥

॥প্রথম অধ্যায়॥

দেবী ভাগবত হইতে উল্লেখ করা হইল–

ভূমৌনিপতিতা যেতুচ্ছায়াঙ্গবয়বাঃ ক্ষণাৎ।
জন্মুঃ পাষাণত্বাং সর্ব্বে লোকানাং হিতহেতবে॥

সতীর ছায়া অঙ্গের অবয়ব ভূমিতে পড়ামাত্রই তা পাষাণে পরিণত হয়েছিল। এ সবই দৈবী ঘটনা ঘটেছিল লোকহিতের নিমিত্ত।

আর তার সঙ্গে সঙ্গে সতীর ইচ্ছানুসারে–

একোহহং বহু স্যাং প্রজায়েয়॥

"আমি এক হতে বহু হব" হিসাবে ওই একান্নটি স্থানে দেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাটিতা হয়েছেন।

BANGLADARSHAN.COM

১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্রথমখণ্ড, পুস্তকের নাম 'ভারতে শক্তি সাধনা'র লেখক শ্রীঅমূল্য নাথ চক্রবর্তীর পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতে শক্তিপূজা অর্থাৎ মাতৃরূপে পরমেশ্বরের আরাধনা চলিয়া আসিতেছে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা ও সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত মহেঞ্জোদারো নগরে দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।

স্যার জন মার্শেল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, সে সময়ে ভারতবর্ষে শিব ও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল।

সেই সময় হইতে পরবর্তী যুগে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালয়িত্রী রূপে বিশ্বজননী মাতৃশক্তির পূজা সমাজে চলিয়া আসিতেছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত লিপিসমূহের এখনও নিঃসন্ধিগ্ধ পাঠোদ্ধার হয় নাই। কোন কোন মনীষীর মতে ঐ সকল লিপিতে তান্ত্রিক বীজমন্ত্র অর্ন্তনিহিত আছে।

দক্ষযজ্ঞের উপাখ্যানে আমরা দেখিতে পাই–দক্ষ প্রজাপতি বৈদিক উপাসক ছিলেন। তিনি যজ্ঞোপলক্ষে শিবকে নিমন্ত্রণ না করার কারণ, তাঁহার মতে মহাদেব অবৈদিক দেবতা ছিলেন। ইহাই সংঘর্ষের মূল কারণ।

দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীদেবী স্বয়ম্বর সভায় মহাদেবকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে দক্ষ প্রজাপতির কোন হাত ছিল না। এই বিবাহের পর হইতেই তিনি মহাদেব ও স্বীয় কন্যা সতীদেবীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে কালী, ছিন্নমস্তা ইত্যাদি ভীষণ মূর্তি দেবীর পূজার পরিকল্পনা বা

সমর্থন বেদে নাই। উপরোক্ত কারণ হইতে যাঁহারা শক্তিপূজা অবৈদিক বলেন তাঁহারা তাঁহাদের যুক্তির সমর্থন পান।

কেহ কেহ বলেন আদিমবাসীদের নিকট হইতে তন্ত্রশাস্ত্র গৃহীত হইয়াছে। ইংরাজী হিসাব অনুসারে দ্রাবিড়, পৌণ্ডকেরা ভারতের আদিবাসী, সুদূর দাক্ষিণাত্যে তাহারা বাস করে। আমরা দেখিতে পাই, ভারতের সর্বত্র প্রাচীনকাল হইতে শক্তিপূজা প্রচলিত আছে।

যথা–ভুবনেশ্বরে ভুবনেশ্বরী, কটকে কটকচণ্ডী, কামরূপে কামাখ্যাদেবী, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যাবাসিনী, বৃন্দাবনে যোগমায়া, ৺কাশীধামে অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরভৈরবী, জব্বলপুরে চতুঃষষ্ঠী যোগিনী, নেপাল গুহ্যেশ্বরী, রাজপুতানায় গায়ত্রীদেবী ইত্যাদি সর্বভারতে আমরা দেখিতে পাই শক্তিপূজা প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত ৫১ শক্তিপীঠে দেবী বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝা যায় শুধু বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণই তন্ত্রশাস্ত্র গৃহীত হইয়াছে–এই উক্তি সমীচীন নয়। অবশ্য আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের তন্ত্রশাস্ত্রে কিছু দান থাকা স্বাভাবিক। এই গ্রন্থে বৈদিক সাহিত্যে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে শক্তি সাধনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং রামায়ণ ও মহাভারতের আলোচনা প্রসঙ্গে কোন কোন স্থানে তন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকের নাম 'নানা রূপে নানা নামে জগন্মাতা'র লেখক নিগূঢ়ানন্দ মহাশয়ের পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

BANGLADARSHAN.COM

এই মাতৃসাধনা ভারতবর্ষে শাক্তধর্ম নামে আত্ম প্রকাশ করেছে। মাকে নির্ভেজাল শক্তির প্রতীক বলে মনে করা হয় বলেই তাঁর নামে যে ধর্ম দেখা দিয়েছে তাকে শাক্তধর্ম বলে। শাক্তধর্মেই তন্ত্র সাধনার এক বিশেষ ধারা আত্মপ্রকাশ করেছে। যার ফলে এই ধর্মে বহু ইন্দ্রিয়জ অনৈতিক দিক দেখা দিয়েছে, যদি ও তন্ত্রের যথার্থ অর্থের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। তন্ত্র অর্থ–

"তন্যতে বিস্তারিয়তে জ্ঞানম্, অনেন ইতি তন্ত্রম"

যে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়ে মুক্তি দান করে তাকেই বলে তন্ত্র। এই শক্ত ধর্মেরই আরাধ্যা দেবী হলেন কালী, দুর্গা, পার্বতী দেবী ও অন্যান্য মাতৃদেবী। এই তন্ত্রের উৎপত্তি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকে। সিন্ধু সভ্যতায় ও প্রাগৈতিহাসিক আর ও নানা সাক্ষ্যে তন্ত্রের উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমানে আসাম, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও দক্ষিণ ভারতে নানা স্থানে এর ব্যাপক প্রসার। এই আধুনিক প্রসারের সূত্রপাত সম্ভবত; খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী থেকে।

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য হইতে উল্লেখ করা হইল–

কলা যা যাঃ সমুদ্ভুতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে।
পূজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে মুনে॥

ভারতবর্ষের যত নগর এবং গ্রামে যত দেবী রহিয়াছেন তাঁহারাও বিধি পূর্বক মহাদেবীরূপেই পূজিতা হইয়া থাকেন–কারণ মুলে তাঁহারা আদ্যাদেবী হইতে কিছু পৃথক নন, তাঁহারাও সকলে একই মহাদেবীর

বিশেষ বিশেষ কলামাত্র। এইরূপে মূলদেবীর কলাস্পদা বলিয়াই ভারতবর্ষের সকল গ্রাম্যদেবীকেও মহাদেবীর সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে।

লিঙ্গ পুরাণ হইতে উল্লেখ করা হইল–

সেই ভগনাম্নী জগদ্ধাত্রী লিঙ্গরূপী মহাদেবের ত্রিবেদিকাস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃতি স্বরূপা, লিঙ্গরূপী দেব নিয়ত সেই ভগের সহিত যুক্ত আছেন সেই অভয় হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হয়। ঐ লিঙ্গমূর্তি শির জ্যোতির্ন্ময় ও মামাতিমিরের পারে নিয়ত বিদ্যমান। ঐ শিবলিঙ্গের সংযোগে অর্দ্ধ–স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হয়।

কালিকাপুরাণ হইতে উল্লেখ করা হইল–

কৃতং তপো যদর্থন্ত চন্দ্রভাগাহ্বয়ে গিরৌ।
বসিষ্ঠেন যথাপূর্বং বর্ণিরূপেন বেধসঃ॥ (৬৬)
বচনাদুপদিষ্টা সা তপশ্চর্য্যাং দুরত্যয়াম্।
যথা প্রসন্নো ভগবান বিষ্ণুঃ প্রত্যক্ষতাং গত॥ (৬৭)
বরং যথা দদৌ তস্যৈ মর্য্যাদা স্থাপিতা যথা।
যথা বা বাঞ্জিতঃ স্বামী বসিষ্টঃ স তয়া মুনিঃ॥ (৬৮)
মেধাতিথের্যথা যজ্ঞে বহ্নৌ ত্যক্তং তয়া বপুঃ।
যথা তত্তনয়া জাতা তস্যৈ তদ্বিস্তরাৎ তদা॥ (৬৯)
সাবিত্রী কথয়ামাস ক্রমাদ্বহুয়া সহ॥ (৭০)

BANGLADARSHAN.COM

মার্কণ্ডেয় বলিলেন–সাবিত্রী এই কথা বলিয়া সন্ধ্যার উৎপত্তি, তিনি যে উদ্দেশ্যে চন্দ্রভাগ পর্বতে তপস্যা করেন তাহা, বিধাতার বচনানুসারে সন্ধ্যাকে বসিষ্ঠের ব্রহ্মচারিরূপে তপস্যা শিক্ষা দান, তদুপদেশ সন্ধ্যার কঠোর তপস্যা, ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া যেরূপে সন্ধ্যার প্রত্যক্ষ গোচর হন তাহা, সন্ধ্যাকে বিষ্ণুর বরদান, মর্য্যাদা স্থাপন, উপদেশক বসিষ্টকে পরজন্মে স্বামী করিতে সন্ধ্যার অভিলাষ, মেধাতিথির যজ্ঞানলে তাঁহার দেহত্যাগ এবং মেধাতিথির কন্যারূপে তাঁহার উৎপত্তি–অরুন্ধতীকে এ সমস্ত কথাই সুবিস্তারে যথাক্রমে বহুলার সহিত বলিলেন।

বর্ধমান চর্চা হইতে উল্লেখ করা হইল–

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা দেব দেবীর মন্দির গাত্রে ফলক বা লেখা, মূর্তি ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা ইতিহাসের দলিল বলা চলে। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে বিশেষভাবে অন্বেষণ ও বিচার বিশ্লেষণের, বরাকরের দেউল–কল্যাণেশ্বরীর মন্দির, ডিসের গড়ে পীরের দরগা, জামালপুরে বুড়োরাজ, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলাপীঠ, বাঘনাপাড়া, কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, দেনুড় ইত্যাদি স্থানে বৈষ্ণব সংস্কৃতির নিদর্শন, কালনা ও বোহারে মুসলমান সংস্কৃতির নিদর্শন, মণ্ডলগ্রাম, নারকেলডাঙ্গা, পাঁড়ুই, চোতখণ্ড ইত্যাদি স্থানে মনসা পূজার

নজীর, মেমারী, মন্তেশ্বর, ভাতাড়, পূর্বস্থলী ইত্যাদি অঞ্চলে কালুরায়, কটারায়, বাঁকুড়ারায়, সুন্দররায়, মামদোরাজ, বুড়োরাজ ইত্যাদি নামে ধর্মরাজ পূজার নজীর রয়েছে।

শিবপুরাণ হইতে উল্লেখ করা হইল–

সর্ব্বা লিঙ্গময়ী ভূমিঃ লিঙ্গময়ং জগৎ।
লিঙ্গময়ানি তীর্থানি সর্ব্বং লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিতম্॥ (৬)
সংখ্যা ন বিদ্যতে তেষাং কিঞ্চৈব তদ ব্রবীমি হ।
যৎ কিঞ্চিদৃশ্যতে দৃশ্যং বণ্যতে স্মর্য্যতে চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং শিবরূপঞ্চ নান্যদস্তীতি কিঞ্চন॥ (৭)

এই সকল ভূমিই লিঙ্গময়ী, এই জগৎ লিঙ্গময়, লিঙ্গময় তীর্থ সকল, লিঙ্গে সকলই অধিষ্ঠিত। সেই লিঙ্গের সংখ্যা কোথা হইতে হইবে? যাহা কিছু দৃশ্য দেখা যায়, বর্ণনা করা যায়, অথবা স্মরণ করা যায়, সেই সকলই শিব স্বরূপ, শিব ব্যতীত অন্য কিছুই নাই।

তত্তং সুখানুরাগেন শিবপূজাং বিদুর্বুধাঃ।
পীঠমম্বাময়ং সর্ব্বং শিবলিঙ্গঞ্চ চিন্ময়ম্॥ (২২)
যথা দেবীমুমামস্কে ধৃত্বা তিষ্ঠতি শঙ্কর।
তথা লিঙ্গমিদং পীঠং ধৃত্বা তিষ্ঠতি সন্ততম্॥ (২৩)

সমুদয় লিঙ্গপীঠ পার্ব্বতী স্বরূপ ও সমুদয় লিঙ্গই চিন্ময় শিবস্বরূপ জানিবে। ভগবান শঙ্কর যে প্রকার দেবী কাত্যায়নীকে ক্রোড়ে ধারণ করত অবস্থান করেন, সেইরূপ ঐ লিঙ্গ ও পীঠকে অবলম্বন করিয়া নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

BANGLADARSHAN.COM

॥প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥দ্বিতীয় অধ্যায়॥

১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (তীর্থক্ষেত্র কেতুগ্রামে মহাপীঠ বহুলা) দিগন্তিকা পত্রিকার সম্পাদক, খোন্দোকার গোলাম কবির মহাশয়ের লিখিত পত্রিকা হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল–

তুহিনা বলছিল, ব্রহ্মার মানস পুত্র হিমালয় রাজ দক্ষমুনির দক্ষ যজ্ঞের কথা যাকে কেন্দ্র করে মহামায়া সতীর দেহটাকে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রদ্বারা ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল, আর ছড়ানো ছিটানো দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়ে এক একটা মহাপীঠে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, আরও বলছিল যে, চলুন না গিয়ে দেখে আসবেন, কি মাহাত্ম্য ঐসব মহাপীঠের।

থাকতে পারলাম না, ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে বেরিয়ে পড়লাম তুহিনাকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়া থেকে বাস ধরে ১৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নামলাম গিয়ে কেতুগ্রামের বাসস্টপেজে। সেখান থেকে ১০ মিনিটের পথ পায়ে হেঁটে পৌঁছিলাম তীর্থ ক্ষেত্রে কেতুগ্রামের মহাপীঠ বহুলায়, সেখানে মহামায়া সতীঅঙ্গ বাম বাহু পতিত হয়, এসেই দেখলাম মহামায়া সতীর মন্দিরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে–

“বহুলায়াং বামবাহু বহুলাক্ষ্যা চ দেবতা।
ভীরুক ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক॥”

BANGLADARSHAN.COM

মন্দিরের ভিতরে, শ্রীশ্রী বহুলা দেবীর প্রকাণ্ড পাষাণ মূর্তি অবস্থিত। সাড়ে তিন হাত উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর সম্মুখভাগে খোচিত বহুলা দেবীর মূর্তি তিন থাক বিশিষ্ট পীঠের উপর দণ্ডায়মান, ত্রিনয়না, স্তিমিত নেত্রা ও চতুর্ভুজা, চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে বহুলার তন্ত্রশাস্ত্র উহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সনাতন ধর্মের দেশে বাঙালীর উদাসী মন তাই পাগল হয়ে উঠে মা, মাটি ও মানুষকে ঘিরে দেবদেবীর অস্তিত্বের উপর, তাই বাঙালী মেতে উঠে ঘরে ঘরে বারো মাসে তেরো পার্বণকে ঘিরে, আর ঘোষণা করে বার বারই দেব-দেবীর মাহাত্ম্য।

কথিত আছে, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পূর্বে ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষমুনির পত্নী প্রসূতির গর্ভে সতীরূপে মহামায়া জন্মগ্রহণ করেন, নারদমুনির ঘটকালিতে শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ হয়, শিব সর্বদায় বিকট সাজে যত্রতত্র ঘুড়িয়ে বেড়ান দেখিয়া দক্ষমুনি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন। যখন তখন তিনি জামাতা শিবকে কটু বাক্য বলেন। শিব ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া মহামায়া সতীকে লইয়া কৈলাস পর্বতে চলিয়া যান এবং সেইখানে বসবাস করিতে থাকেন।

কিছুদিন পর জানা যায় দক্ষমুনি এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন, সেই যজ্ঞে শিব ছাড়া সমস্ত দেবতারাই আমন্ত্রিত হইয়াছেন। মহামায়া সতী নারদের মুখে যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা শুনিয়া পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে শিবের কাছে আবেদন করেন, শিব বিনা নিমন্ত্রণে সতীকে পিতার গৃহে যেতে অনুমতি দিলেন না।

মহামায়া সতী তখন দশ মহাবিদ্যারূপে অর্থাৎ–কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভূবনেশ্বরী ভৈরব, ধুমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী, মহালক্ষ্মী ও ছিন্নমস্তারূপে শিবের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

মহামায়া সতীর এই রূপটি দর্শনে শিব পরম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং সতীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর বাধা দিতে সাহস করিলেন না, ফলে সতী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পিতার গৃহে আসিলেন, তাহার বেশ মলিন এবং বদন বিস্তস্ক দেখিয়া মনে হয় স্বামীর গৃহে সতী প্রচণ্ড কষ্টে দিন কাটান।

তাহাকে দেখিয়াই সমবেত দেব মণ্ডলীর সম্মুখে ঐ দক্ষমুনি শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। পতিনিন্দা শুনিয়া অভিমানি মহামায়া সতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নিন্দার পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ হবে, তাহা পিতাকে জানাইয়া দিয়া সতী সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করিলেন।

সতীর সঙ্গে নন্দী ও কৈলাস থেকে দক্ষ গৃহে আসিয়াছিলেন, তিনি মহামায়া সতীর দেহত্যাগ করা দেখে কৈলাস গিয়া শিবকে সবই বলিলেন।

ফলে শিব ক্ষিপ্ত হয়ে অনুচর বৃন্দদের সঙ্গে নিয়ে দক্ষভূমিতে প্রবেশ করিয়া দক্ষমুনির প্রাণনাশ করিয়া মহামায়া সতীর মৃত দেহ স্কন্ধে তুলিয়া তাঁহার গুণগান করিতে করিতে নানাস্থানে উন্মাদ হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন সতীর মৃত দেহ তাঁহার স্কন্ধের উপর পচিয়া বিগলিত হইতেছে, তখন ব্রহ্মার নির্দেশে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা মহামায়া সতীর দেহটাকে ৫১টা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ফেলিয়া দেন।

BANGLADARSHAN.COM

আর এই ৫১টি খণ্ড দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে পড়েই ৫১টি মহাপীঠে পরিণত হয়, আর সেই মহাপীঠের অন্যতম পীঠ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায় কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার কেতুগ্রামের সতীপীঠ বহুলা বা বহুলাক্ষ্মী। সেই পৌরাণিক যুগ থেকে আজও এখানে ঘটা করে প্রতি বছর যাগযজ্ঞ সহকারে এই মহাপীঠে মহাযোজ্ঞ আরম্ভ হয়, দক্ষিণ মুখি একটা কক্ষ বিশিষ্ট দেবীর মন্দির গৃহে শারদীয়া দুর্গা পূজার সময়, এই পূজার দিন সূর্য অস্ত হইতে সপ্তমীর দিন সূর্য উদয় পর্যন্ত শাস্ত্র সম্মত বিধানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বত্যয়ন পূজা করানো হয়, বহুলা দেবীকে ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজল দিয়া স্নান করানো হয়।

মহানবমীর দিনে বহুলা দেবীকে নববস্ত্র পরিধান করানো হয়, ঐদিনেই দেবীর সম্মুখে ছাগল ও মহিষ বলিদান দেওয়া হয়, এমনকি দোল পূর্ণিমার দিনে বহুলা দেবীর মন্দিরে অষ্টপ্রহর বা ২৪ ঘণ্টাব্যাপি নাম সংকীর্তন হয়। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে বহুলা দেবীর মূর্তির পার্শ্বে একটি গণেশ মূর্তি আছে।

এই গণেশ মূর্তিটি চতুর্ভূজ নয়, এটি অষ্টর্ভূজ গণেশ মূর্তি।

কথিত আছে কোন এক সময়ে শিব অষ্টর্ভূজ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

এই মহাপীঠকে ঘিরে দেশ বিদেশের বহু পূণার্থী এখানে আসেন নানা আশা নিয়ে ইচ্ছে পূরণের তাগিদে, কাহারো আশা পূর্ণ হয়, আবার কারো হয় না, তবু এ প্রতিদিন, প্রতিমাস ও প্রতিবছর আসা যাওয়ার শেষে নেই, চোখের জলে মা বহুলার নিকট আবেদন ও নিবেদন করতে। তীর্থ ক্ষেত্রে কেতুগ্রামের মহাপীঠ বহুলার এই মন্দিরে।

১৩৬২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘বাঙলার তীর্থ’ পুস্তকের লেখক শ্রীঅক্ষয় চৈতন্য মহাশয়ের পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

কাটোয়া আমোদপুর রেলপথে কাটোয়া হইতে ১২.৮ কিমি বায়ুকোণে পাঁচুন্দী ষ্টেশন। কেতুগ্রাম পাঁচুন্দীর ৩.২ কিমি দক্ষিণে। কেতুগ্রাম মহাপীঠ। উক্ত মহাপীঠের নাম বহুলা, এখানে সতীর বামবাহু পড়িয়াছিল, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বহুলা বা স্থানীয় নামানুসারে বহুলাক্ষ্মী।

সাড়েতিন হাত উচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তর খণ্ডের সম্মুখভাগে খোদিত বহুলাদেবীর মূর্তি তিন থাক বিশিষ্ট পীঠের উপর দণ্ডায়মানা, ত্রিয়না, স্তিমিতনেত্রা ও চতুর্ভূজা। তাঁহার দক্ষিণোর্ধ্ব হস্তে কঙ্কাতিকা, বামোর্ধ্ব হস্তে দর্পণ, কর্ণে বিচিত্র কর্ণাভরণ ও মস্তকে কিরাট। মূর্তি শিল্পের চিরবৈরিগণ কর্তৃক নিম্নবাহু দুইটি খণ্ডিত; নাসিকাগ্র ছিন্ন। তথাপি মুখকমলে কী স্বর্গীয় সুষমা। শিল্পীর কল্পলোকের বা মানসী প্রতিমাকে যে এমনভাবে প্রস্তরে রূপায়িত করা যায় তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। দেবীর দক্ষিণাধোভাগে গণেশের এবং বামাধোভাগে দন্তহস্ত দেববিশেষের–সম্ভবতঃ কার্তিকের মূর্তি। সাধারণত জয়দুর্গার ধ্যানে দেবীর পূজা হয়।

ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে খোদিত অষ্টভূজ নটরাজ গণেশের মূর্তি বহুলার মন্দিরে পূজিত হন।

বিঃ দ্রঃ=বহুলার দেবোত্তর সম্পত্তি নষ্টপ্রায়, সেবাপূজার সুবন্দোবস্ত নাই। ফাটল ধরিয়া ক্ষুদ্র দালানটির পতনোম্মুখ হইয়াছে।

BANGLADARSHAN.COM

১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ওভার ল্যাণ্ড পত্রিকায়, বাংলার শাক্ত পীঠের লেখক সোমনাথ নন্দী মহাশয়ের লেখা হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

দক্ষযজ্ঞে বরাহূত হয়ে এলেন পরাভপরা ব্রহ্মশক্তি স্বরূপিনী দেবী সতী। বিনা আমন্ত্রণে সতীর আগমন দেখে ক্রোধে জ্ঞানহারা দক্ষ। শিবনিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন তিনি। সহ্য করতে পারলেন না সতী পতিনিন্দা। যোগবলে করলেন দেহত্যাগ। সতীহীন শিব তখন ধারণ করলেন সংহারমূর্তি। ক্রোধান্মত্ত শঙ্করের কোপানলে ধ্বংস হল দক্ষের অসমাপ্ত যজ্ঞ। বিরহবিধুর ত্রিপুরারি দেবী সতীর প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে স্থাপন করে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে লাগলেন সারা বিশ্ব, ধূর্জটির বিরহাগ্নি প্রশমনের জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ শরণাপন্ন হলেন ত্রিলোক পালক ভগবান বিষ্ণুর। দেবগণের প্রার্থনায় বিষ্ণু চক্রদ্বারা খণ্ডিত করতে লাগলেন সে দেহ। পৃথিবীর যে যে স্থানে পতিত হল সতীর দেহাংশ, কালক্রমে তা অগ্নিভূত হয়ে প্রকাশিত হল দেববন্দিত মহাপীঠরূপে। আপন দেহাংশসম্ভূত সেই শিলাকে কেন্দ্র করে জগম্মাতা ভক্ত ও সাধকদের অভীষ্ট পূরণের জন্য মহাপীঠ সমূহে হলেন নিত বিরাজিতা। দেবাদিদেব মহেশ্বর ও ভক্ত সাধকদের রক্ষাকল্পে মহাপীঠে হলেন অবস্থানরত পীঠভৈরব রূপে।

পশ্চিমে হিংলাজ (পাকিস্থান) থেকে পূর্বে চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) এবং উত্তরে মানসসরোবর (তিব্বত) হতে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার ৫১টি স্থানে ব্যাপ্ত এই মহাপীঠমালা।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু পীঠের তালিকা এখানে নিবেদিত হল–

পীঠনাম	সতীঅঙ্গ	পীঠাধিশ্বরী	পীঠভৈরব	স্থান	পথনির্দেশ
ক) কালীঘাট	দক্ষিণ চার অঙ্গুলি	কালিকা	নকুলীশ	কালীঘাট	দক্ষিণ কলকাতা।
খ) বহুলা	বামবাহু	বহুলা	ভীরুক	কেতুগ্রাম	বর্ধমানের কেতুগ্রাম।
গ) যুগাদ্যা	দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ	যুগাদ্যা বা যোগাদ্যা	ক্ষীরকণ্ঠ	ক্ষীরগ্রাম	বর্ধমানের ক্ষীরগ্রাম।
ঘ) নলহাটী	কণ্ঠনালী	কালিকা	যোগীশ	নলহাটি	নলহাটি, বীরভূম।

২০০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতি'র লেখক এককড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

॥কেতুগ্রামের বহুলা॥

অতীতের বহুলাপীঠ বর্তমানের কেতুগ্রাম, কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কেতুগ্রাম একটি প্রাচীন নাম। কাটোয়া থেকে সরাসরি বাসে যাওয়া যায়। কাটোয়া থেকে ১২/১৪ কিমি দূরে অবস্থিত, গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বহুলা শক্তিপীঠ।

কেতুগ্রাম সম্পর্কে ১৯৯৪ এর বর্ধমান গেজেটিয়ারে যে বিবরণ দেওয়া আছে তাই দিয়ে শুরু করা যাক।

BANGLADARSHAN.COM

Ketugram (88.4E.23.42N) the head quarters of the police station of the same name (85) having an area of 849.52 hectares and population of 4945 according to the census of 1971. It is a Sakti Pith where the Sati's left arm is said to have fallen and was a seat of Tantric worship in medieval times as evidenced by the temple of Bahula located here, the icon is made of Black basalt with the icons of Kartik and Ganesh on the left and the right respectively. It is said that the King Chandra Ketu first established the icon of Bahula.

কেতুগ্রাম ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠ। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। সাধারণের ধারণা বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীর বামবাহু কেতুগ্রামেই পড়ে ও বহুলা পীঠস্থান। কিন্তু ১৯৯৪ সালের বর্ধমান গেজেটিয়ার কেতুগ্রামের যে বিবরণ দেওয়া আছে তাতে বহুলার উল্লেখ আছে।

॥দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥তৃতীয় অধ্যায়॥

ইংরাজী ২৫/১২/১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, একান্নপীঠ পরিক্রমার্থী এক বিশেষ সন্ন্যাসী পরিক্রমা করিতে করিতে কেতুগ্রামের সতীপীঠ ‘বহুলা’ দেবীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ‘বহুলা’ দেবীর মন্দিরে আসিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং বলিলেন যে বোধহয় দেবী নিজের মহিমা নিজে প্রচার করিবার জন্য এই সন্ন্যাসীকে আনিয়াছেন।

সন্ন্যাসা যাহা বলিলেন তাহা উক্ত স্থানে এক কাগজে লিখিয়া লইয়াছিলাম। উনি যাহা লিখিলেন তাহা নিম্নে লেখা হইল।

ভারতবর্ষের একান্নপীঠের সতীপীঠ ‘বহুলাদেবী’ কেতুগ্রামে এই মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। ‘বহুলা’ দেবীর ভীরুক ভৈরব, তিনি এই দেবীর অঙ্গেই বিরাজমান। দেবীর সম্পূর্ণ ফলকটি ‘বামবাহু’ শিবলিঙ্গ, ইনি ষোড়শদল পদ্মের উপর, গঙ্গা, ইন্দ্র, গণেশ, সরস্বতী সহ বিরজিতা। এই সর্বসিদ্ধি দায়িনী ‘বহুলা’ দেবী ভক্তের বিদ্যা এবং সিদ্ধি দান করেন।

মাতৃ আদেশ প্রাপ্ত–কুলাবধূত বিশ্ব বিজয়ানন্দ সরস্বতী। (আসাম)

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শক্তির উৎস সন্ধানের লেখক অযাচকের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

BANGLADARSHAN.COM

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেভূভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

মা-ই আমাকে সৃষ্টি করেছেন মা-ই আমাকে কোলেপিঠে বড় করেন, মায়ের কোলেই আমি খেলা করি। তিনিই আমাকে প্রহার করেন, তাঁরই উপর রাগ করি, আবার তাঁরই আঁচল ধরে কাঁদি, তিনিই কোলে তুলে আবার আদর করেন। তাঁরই আঁচল ধরে লুকোচুরি খেলা করি। পরিশেষে তাঁরই কোলে আমি চিরনিন্দ্রায় ঢলে পড়ি।

তিনি আদ্যাশক্তি। তাঁকে বিভিন্ন ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করলেও মূলত তিনি এক, অভিন্ন এবং অদ্বিতীয়। আদ্যাশক্তির উদ্যেশ্যে আদ্যাস্তবে ভক্তসাধক তাই বলেছেন–

বিরজা উড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্বতে
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী
বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী
কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নীপরা
দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী॥

যিনি উড়িষ্যায় বিরজা তিনিই আসামে কামাখ্যারূপিণী, তিনি বঙ্গদেশে কালিকা এবং তিনিই অযোধ্যায় মহেশ্বরী। বারাণসীতে তিনি অন্নপূর্ণা, গয়াক্ষেত্রে তিনি গয়েশ্বরী, কুরুক্ষেত্রে তিনি ভদ্রকালী, বৃন্দাবনে তিনি কাত্যায়নী-শক্তি, দ্বারকায় তিনি মহামায়া এবং মথুরাতে তিনি মহেশ্বরী রূপে প্রসিদ্ধ। একই শক্তি, এক এক ক্ষেত্রে এক এক নামে এক এক রূপে প্রকাশিত। স্বরূপত কিন্তু তিনি এক ও অভিন্ন।

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব) লেখক ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত পুস্তক এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী ও ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মস্বরূপিনী। ব্রহ্মা বিষ্ণুমায়া চণ্ডীর স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন–

ত্বয়ৈব ধায্যতে সর্বং ত্বয়ৈতং সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥

হে দেবি, তুমিই সব কিছু ধারন কর, তুমি জগৎ সৃষ্টি কর, তুমিই পালন কর, তুমিই প্রলয়কালে গ্রাস কর।

আর্যদের প্রতীক প্রীতিই পরবর্তীকালে মূর্তিপূজার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পুরাণের যুগেই বহুতর দেবতার আবির্ভাব হয়েছে এবং মূর্তিপূজা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাণগুলির রচনাকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব না হলেও ভারত ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তরাজাদের সময়েই পৌরাণিক ধর্ম তথা মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে হিন্দুসমাজে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

BANGLADARSHAN.COM

মূর্তিপূজা সম্পর্কে অভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করে প্রাচীনকালের মুদ্রা ও ভাস্কর্য। মুদ্রাগুলি এ বিষয়ে প্রাচীনতম প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রাচীন মুদ্রার সমকালের মূর্তি পাওয়া যায় নি। গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় যেমন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদানের চিত্র অংকিত আছে (কাচটাইপ–সমুদ্রগুপ্ত, ছত্রটাইপ–২য় চন্দ্রগুপ্ত) তেমনি লক্ষ্মী, কার্তিকেয়, গঙ্গা, শিব, প্রভৃতি দেবতাদের মূর্তি মুদ্রিত আছে। যাগযজ্ঞ এবং দেববিগ্রহ পূজা–এই উভয় রীতিই গুপ্ত যুগে প্রচলিত ছিল। এই যুগেরই (খৃষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দী) বিভিন্ন (ভিটা শীল, বেসার শীল প্রভৃতি) শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার মূর্তি এবং প্রতীক অংকিত আছে। অন্যান্য যজ্ঞ এবং অনুষ্ঠিত হোত, দেবমূর্তি পূজার রীতি ও এইযুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে।

ভবস্য পত্নী তু সতী ভবং দেবমনুব্রতা।

কোন এক সময়ে দেব ও ঋষিদের সভায় দক্ষ উপস্থিত হলে দেব ও ঋষিগণ দক্ষকে অভিবাদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে উপবেশন করলেন। কিন্তু শিব আসন থেকে উত্থিত হলেন না, দক্ষের সৎকার ও করলেন না। জামাতৃকৃত এই অসম্মানে ক্ষুব্ধ দক্ষ শিবনিন্দা করলেন সর্বসমক্ষে, তৎপরে তিনি অভিশাপ দিলেন,– ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে শিব যজ্ঞভাগ পাবেন না।

অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।
সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ॥

এই অভিশাপের কথা শুনে নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষকে এবং ঋষিগণকে অভিশাপ দিলেন।

বুদ্ধ্যা পরাভিধায়িনা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোহস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোহচিরাৎ॥

অবিদ্যার অধিকারী আত্মতত্ত্ববিস্মৃত পশুতুল্য এই দক্ষ শীঘ্রই স্ত্রীকামী হোক, এর মুখ ছাগমুখ হোক।

মহাভারতের দ্রোণপর্বে দক্ষযজ্ঞনাশের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনী পৌরাণিক কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্পষ্টভাবে কাহিনীটি থেকে মনে হয় যে দক্ষের যজ্ঞে শিবের ভাগ না থাকাতেই শিব ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞ নাশ করেছিলেন। দক্ষরাজ যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে যজ্ঞ আরম্ভ করলে মহাদেব কূপিত হয়ে যজ্ঞের সকল সামগ্রী বিনষ্ট করতে শুরু করলেন। মহাদেবের ক্রোধে ত্রিভুবন বিচলিত হোল, সলিল রাশি সংক্ষুব্ধ, বসুন্ধরা কম্পিত, পর্বত ও দিকসমূহ বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হোল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হোল। সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা বিনষ্ট হোল। ঋষিগণ ভীত কম্পিত হলেন। পুরোডাশ চর্বণরত সূর্যদেবের দন্ত উৎপাটন করিলেন মহাদেব। মহাদেব দেবগণের প্রতি শরজাল বিস্তার করলেন। অতঃপর দেবগণ মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁর যজ্ঞভাগ দিতে নির্দেশ করলেন। শিব ও দক্ষযজ্ঞ পুনরায় স্থাপিত করলেন।

দক্ষস্য যজমানস্য বিধিবৎ সংভৃতং পুরা।
বিব্যাধ কুপিতো যজ্ঞং নির্ভয় সঃ ভবস্তদা॥
ধনুষা বাণমৃত সৃজ্য সুঘোষং বিননাদ হ।
তে ন শর্ম কুতঃ শান্তিং লেভিরে স্ম পুরস্তদা॥
বিদ্রুতে সহসা যজ্ঞে কুপিতে চ মহেশ্বরে।
তেন জ্যাতলক্ষোষেণ সর্বে লোকাঃ সমাকুলাঃ॥
বর্ভূবুবশগাঃ পার্থ নিপেতুশ্চ সুরাসুরা।
আপশ্চুক্ষুভিরে সর্বাশ্চকল্পে চ বসুন্ধরা॥
পর্বতাশ্চ বাশীর্যন্ত দিশো নাগাশ্চ মোহিতাঃ।
অন্ধাশ্চ তমসা লোকা ন প্রাকাশন্ত সংবৃতাঃ।
জঘ্নিবান সহ সূর্ষেণ সর্বেষাং জ্যোতিষাং প্রভাঃ॥
পূষাণসভ্যদ্রবত শংকরঃ প্রহসন্নিব।
পুরোডাশং ভক্ষয়তো দশনান বৈ ব্যশাতয়ৎ॥
ততো নিশ্চক্রমুর্দেবা বেপমানা নতাঃ স্ম তম্।
পুনশ্চ সন্দধে দীপ্তান দেবানাং নিশিতান শরান॥
সধূমান সস্ফুলিঙ্গপংশ্চ বিদ্যুত্তোয়দসন্নিভান।
তং দৃষ্টা তু সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্য মহেশ্বরম॥
রুদ্রস্য যজ্ঞভাগঞ্চ বিশিষ্টং তেহস্বকল্পয়ন।
ভয়েন ত্রিদশা রাজন শরণঞ্চ প্রপেদিরে॥

BANGLADARSHAN.COM

পূর্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমূদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কূপিত ও নির্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বাণ পরিত্যাগ পূর্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার জ্যা-নিঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমূদয় সুরাসুর নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিলরাশি সংক্ষুব্ধ, বসুন্ধরা কম্পিত, পর্বত ও দিকসকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হওয়াতে সমূদয়ই অপ্রকাশিত হইল। সূর্য প্রভৃতি সমূদয় জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল।...ঐ সময় সূর্যদেব যজ্ঞীয় পুরোভাগ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শংকর হাস্যমুখে তাঁহার নিকট ধাববান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে কম্পিত কলেবর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাহাতে ও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণের প্রতি স্ফুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ সুনিশ্চিত শরজাল সন্ধান করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিশেষরূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

মহাভারতের আর এক স্থানে আছে–

প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য যজতো বিততে ক্রতৌ॥
বিব্যাধ কূপিতো যজ্ঞং নির্ভয়স্তু ভবস্তদা।
ধনুষা বাণমূৎসৃজ্য সঘোষং বিননাদ চ॥
তেন শর্ম কৃতঃ শান্তিং বিষাদং লেভিরে সুরাঃ।
বিদ্ধে চ সহসা যজ্ঞে কূপিতে চ মহেশ্বরে॥
ততঃ সোহভ্যদ্রবদ্দেবান রুদ্রো রৌদ্র পরাক্রমঃ।
ভগস্য নয়নে ক্রুদ্ধঃ প্রহারেণ ব্যশাতয়ৎ॥
পূষাণমভিদুদ্রাব পাদেন চ রুষান্বিতঃ।
পুরোডাশং ভক্ষয়তো দশনাংশ্চ ব্যশাতয়ৎ॥
সংস্তুয়মানস্ত্রিদশৈঃ প্রসসাদ মহেশ্বরঃ॥
রুদ্রস্য ভাগং যজ্ঞে চ বিশিষ্টং তে ত্বকল্পয়ন।
ভয়েন ত্রিদশ রাজন শরণঞ্চ প্রপেদিরে॥
তেনেব হি তুষ্টেন স যজ্ঞঃ সন্ধিতোহভবৎ।
তদ যচ্চাপহৃতং তত্র তত্তথৈব স জীবয়ৎ॥

যজ্ঞকারী প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিস্তৃত করলে, নির্ভীক শিব কুপিত হয়ে ধনুকে বাণ যোজনা করে যজ্ঞকে বিদ্ধ করলেন এবং উচ্চরবেগর্জন করতে শুরু করলেন। সুতরাং যজ্ঞ বিদ্ধ হওয়ায় এবং মহাদেব সহসা কুপিত হওয়ায় দেবগণের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হোল, তাঁরা বিষাদ প্রাপ্ত হলেন।...তখন ভীষণ পরাক্রম রুদ্র দেবতাদের প্রতি ধাবিত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে মহেশ্বর তুষ্ট হলেন। দেবতারা যজ্ঞে রুদ্রের বিশেষ ভাগ নির্দিষ্ট

BANGLADARSHAN.COM

করে দিলেন। হে রাজন! ভয়ে দেবগণ রুদ্রের শরণ গ্রহণ করলেন। রুদ্র তুষ্ট হওয়ায় যজ্ঞ সঞ্জীবিত হোল এবং যাঁর যা কিছু বিনষ্ট হয়েছিল সবই পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মহাভারতে অন্ততঃ আরও দুইস্থানে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী পাওয়া যায়। সৌপ্তিক পর্বের কাহিনী অনুসারে দেবগণ রুদ্রকে না জানার ফলেই যজ্ঞে রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করেন।

তা বৈ রুদ্রমানভ্যো যথাতথ্যেন দেবতাঃ।
নাকল্পয়ন্ত দেবস্য স্থানোর্ভাগং নরাধিপ॥

এখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা দেবগণ, দক্ষ নন। যজ্ঞে ভাগ না থাকায় রুদ্র রুষ্ট হয়ে ধনুর্বাণ নিয়ে যজ্ঞ পণ্ড করতে উদ্যত হলেন। রুদ্রের ক্রোধে পৃথিবী ব্যথিত হলেন, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেন না, বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হোল, নক্ষত্রমণ্ডল উদভ্রান্ত, সূর্য দীপ্তিহীন, দেবগণ ভীতত্রস্ত, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল না, তখন যজ্ঞ ও রুদ্রশরে বিদ্ধ হয়ে মৃগরূপে যজ্ঞস্থল ত্যাগ করলেন।

ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেন হৃদি পত্রিনা।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা স পাবকঃ॥

ত্র্যম্বক অতঃপর সবিতার বাহু, ভগের নয়ন, পূষার দন্ত ভঙ্গ করলেন—যজ্ঞ বিনষ্ট করলেন। অতপর দেবগণ রুদ্রের স্তব করে এবং রুদ্রের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করায় করায় রুদ্র যজ্ঞ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং যার যা ক্ষতি করেছিলেন সব ক্ষতি পূর্ণ করে দিলেন।

শান্তিপর্বে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন দক্ষ নিজেই। তিনি রুদ্রের যজ্ঞভাহ নির্দিষ্ট করেন নি অকারণেই। তখন দধীচির বাক্যে রুদ্র দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করেছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

ন চৈবাকল্পয়দ্ভাগং দক্ষো রুদ্রস্য ভারত।
ততো দধীচি বচনাদ্দক্ষযজ্ঞমপাহরৎ॥

সতীর দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের কাহিনী মহাভারতীয় কাহিনীগুলিতে একেবারেই অনুপস্থিত। এই কাহিনী পরবর্তীকালে কোন কোন পুরাণে সংযোজিত হয়েছে।

॥তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥চতুর্থ অধ্যায়॥

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব) পুস্তকের লেখক ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা হইতে তথ্যগুলি উল্লেখ করা হইল–

কালিকাপুরাণে (৪৩ অঃ) ছদ্মবেশী শিব তপোবতা পার্বতীর কাছে দ্ব্যর্থক ভাষায় আত্মনিন্দা করে বলেছিলেন–

বৃষধ্বজো মহাদেবো ভূতিলেপী জটাধরঃ।
ব্যাঘ্রচর্মাংশুকশ্চৈকঃ সংধাতো গজকৃত্তিনা॥
কপালধারা সর্পৌঘৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু বেষ্টিতঃ।
বিষদগ্ধগলস্ত্র্যক্ষো বিরূপাক্ষো বিভীষণঃ॥
অব্যক্তজন্মা সততং গৃহভোগ্যবিবর্জিতঃ।
জ্ঞাতিভির্বান্ধবৈর্হীনো ভক্ষ্যভোজ্যবিবর্জিতঃ॥
শ্মশানবাসী সততং সৎসঙ্গবিবর্জিতঃ॥

মহাদেব বৃষধ্বজ, ভস্মলিপ্তদেহ, জটাধর, নরকপালধারী, সর্বাঙ্গে সর্পবেষ্টিত, ব্যাঘ্রচর্মের বসন ও গজচর্মের উত্তরীয় পরিহিত, বিষে দগ্ধকণ্ঠ, ত্রিনয়ন–সুতরাং বিরূপাক্ষ, ভয়ংকর, অব্যক্তজন্মা (জন্মপরিচয়হীন), গৃহসুখবর্জিত, জ্ঞাতিবান্ধবহীন, ভক্ষ্যভোজ্যবর্জিত (খাদ্যখাদ্য বিচারহীন), শ্মশানবাসী, সৎসঙ্গবর্জিত।

সতীর সম্মুখে শিবনিন্দাকালে দক্ষ বলেছিলেন–

পঞ্চবক্ত্রো দশভূজা মুখে নেত্রত্রয়ান্বিতাঃ।
কপর্দী খণ্ডচন্দ্রোহসৌ তবাসৌ নীললোহিতঃ॥
কপালী শূলহস্তোহসৌ গজচর্মাবগুণ্ঠিতঃ।
নাস্য মাতা ন চ পিতা ন ভ্রাতা ন বান্ধবঃ॥
সর্পাস্থিমণ্ডিতগ্রীবস্ত্যক্ত্যা হেমবিভূষণম্।
ভিক্ষয়া যোজনং যস্য কথমন্নং প্রদাস্যতি॥

পঞ্চবদন, দশহস্ত, মুখমণ্ডলে তিন চক্ষু, জটাধারী, কলাচন্দ্রশোভিত, নরকপাল শোভিত, শূলধারী, গজচর্মাচ্ছাদিত–তোমার এই নীললোহিত। তার মাতা নেই, পিতা নেই, ভ্রাতা নেই, বন্ধু নেই, তিনি সর্প ও অস্থিশোভিতকণ্ঠ, স্বর্ণালংকার ত্যাগ করেছেন। যাঁর ভিক্ষাই জীবিকা, তিনি কিকরে অন্ন দেবেন?

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ডে) দক্ষ সতীকে বলেছিলেন–

যেনাদ্য কারণে নেহ পতিস্তে ন নিমন্ত্রিতঃ।
কপালধৃক চর্মী ভস্মাবৃততনুস্তথা॥

BANGLADARSHAN.COM

শূল মূণ্ডী চ নগ্নশ্চ শ্মশানে রমতে সদা।
বিভূত্যঙ্গানি সর্বাণি পরিমাষ্টি চ নিত্যশঃ॥
ব্যাঘ্রচর্মপরিধানো হস্তিচর্মপরিচ্ছদঃ।
কপালমালাং শিরসি খট্বাঙ্গঞ্চ করে স্থিতম্॥
কট্যাং বৈ গোনসং বদ্ধা লিঙ্গেহস্থ্যাং বলয়ং তথা।
পন্নগানাঞ্চ রাজানমূপবীতঞ্চ বাসুকীম॥
কৃত্বা ভ্রমতি চানেন রূপেন সততম ক্ষিতৌ।
নগ্না গণাঃ পিশাচাশ্চ ভূতসজ্ঘ হ্যনেকশঃ॥
ত্রিনেত্রশ্চ ত্রিশূলী চ গীতনৃত্যরতঃ সদা।
কূৎসিতানি তথান্যানি সদা তে কুরুতে পতিঃ॥

যে কারণে তোমার পতিকে নিমন্ত্রণ করিনি, শোন, শিব নরকপালের পাত্রধারণকারী, চর্মধারী, ছাইমাখা দেহ, শূলধারী, মুণ্ডিতমস্তক, নগ্ন, সর্বদা, শ্মশানচারী, সর্বপ্রকার বিভূতি (ভস্ম) সর্ব সময়ে গায়ে মাখে, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে, হস্তিচর্ম (ঊর্ধ্বাবরণরূপে) ধারণ করে, মাথায় নরকপালের মালা, হাতে নরকংকাল, কোমরে বহৎসর্প বেঁধে লিঙ্গে অস্থিবলয় বেঁধে সাপের রাজা বাসুকিকে উপবীত করে এইরূপে পৃথিবীতে সব সময় ভ্রমণ করে, অনেক প্রকার ভূত, পিশাচ প্রভৃতি নগ্ন গণসমূহ তাঁর অনুচর। তিনি ত্রিনেত্র, ত্রিশূলী, সব সময়ে নৃত্যগীতে রত। অন্যান্য কুৎসিৎ কর্মও তোমার পতি করে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

কুমারসম্ভব কাব্যে মহাকবি কালিদাস ছদ্মবেশী শিব মুখে যে শিবনিন্দা বসিয়েছেন তাও পূর্ববর্ণনার অনুরূপ। ছদ্মবেশী শিব বলছেন–

করেন চ শম্ভোবলয়ীকৃতাহিনা
সহিষ্যতে তৎপ্রথমাবলম্বনম্॥

হে পার্বতী, তোমার প্রথম অবলম্বন শম্ভুর সর্পবলয়ভূষিত বাহু তুমি কেমনে সহ্য করবে?

বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং
গজাজিন শোণিতবিন্দুবর্ষি ত॥

কলহংসশোভিত নববধূর বস্ত্র কেমন করে রক্তবিন্দুবর্ষী (সদ্যঃ ভিন্ন হওয়ায়) গজচর্মের (শিবের পরিধেয়) সঙ্গে সংযুক্ত হবে?

অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়ো
বিকীর্ণ কেশানু পরেতভূমিষু॥

তোমার আলতা রাঙানো পা দুখানি কেমন করে বিস্তীর্ণকেশ প্রেতভূমি (শ্মশানে) বিচরণ করবে?

স্তনদ্বয়েহস্মিণ হবিচন্দনাস্পদে
পদং চিতাভস্মরজঃ করিষ্যতি॥

আলিঙ্গনকালে তোমার হবিচন্দনে শোভিত হওয়ার যোগ্য স্তনদ্বয়ে চিতাভস্মরজঃ কেমন করে লিপ্ত হবে (অর্থাৎ হরের বক্ষ চিতাভস্মে লিপ্ত)।

বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া।
মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি॥

বৃদ্ধ ষাঁড়ের পিঠে তোমাকে বসে থাকতে দেখে (স্বামীর সঙ্গে) মহৎ ব্যক্তিগণের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হবে।

মহাকবি কালিদাসের সময়েরও (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) আরও পূর্বে পৌরাণিক শিবের রূপগুণগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত ও পুস্তকের নাম বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর বিবর্তনের লেখক ডঃ অতুল সুর মহাশয়ের পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল–

বর্ধমান জেলার উত্তরে ত্রিভূজাকার যে ভূখণ্ড আজ বীরভূম নামে পরিচিত, তাকে আমরা বাঙ্গলার ধর্মীয় সাধনার 'যাদুঘর' বলে অভিহিত করতে পারি। বহু ধর্মেরই এখানে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং বীরভূমের বিচিত্র ভূপ্রকৃতির তার সহায়ক হয়েছে। পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্বতের পাদমূল থেকে যে তরঙ্গায়িত মালভূমি পূর্বদিকে ভাগীরথীস্নাত পলিমাটির দেশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, তা বীরভূমকে বিভক্ত করে দিয়েছে দুই ভাগে–পশ্চিমে বনজঙ্গল পরিবৃত রুক্ষ ও কর্কশ অঞ্চল ও পূর্বে কোমল রসাল সমতলভূমি। বীরভূমের বনজঙ্গলের মধ্যেই ছিল বহু মুনিঋষির তপোবন। যেমন ভাণ্ডারীবনে ছিল বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম, শিয়ানে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির, শীতলগ্রামে সন্দীপন ঋষির, গর্গমুনির ও দুর্বাসা মুনির। বনজঙ্গলের শাশ্বত নির্জনতা বীরভূমকে গড়ে তুলেছিল শাক্তধর্মীয় সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে। এজন্যই শাক্তধর্মের লীলাকেন্দ্র হিসাবে বীরভূমের প্রসিদ্ধি। বস্তুত শাক্তধর্মের লীলাকেন্দ্র হিসাবে বীরভূমের (এড়ু মিশ্রের উক্তি অনুযায়ী এর নাম ছিল কামকোটি) তুলনা আর কোথাও নাই। তন্ত্রবর্ণিত মহাপীঠসমূহের মধ্যে বীরভূমে যত মহাপীঠ আছে, তত মহাপীঠ বাঙ্গলায় তো দূরের কথা, ভারতের আর কোথাও নেই। বীরভূমের প্রায় প্রত্যেক শহরের কাছেই সতীর দেহাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি করে, শাক্তপীঠ আছে। যথা বক্রেশ্বর, কঙ্কালীতলা, লাভপুর, ফুলবেড়িয়া, নলহাটী, বৈদ্যনাথধাম (১৮৫৬ খ্রীঃ পূর্বে বীরভূমের অন্তভূক্ত ছিল) তারাপীঠ ইত্যাদি। এদের মধ্যে তারাপীঠ সিদ্ধপীঠ হিসাবে প্রসিদ্ধ।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সময় কেতুগ্রামের বহুলা ও ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবী বীরভূম জেলার শাক্তপীঠ হিসাবে পূজিত হয়ে আসিতেছে।

BANGLADARSHAN.COM

১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বাঙ্গালার উত্তরাধিকারের লেখক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল–

বাংলাদেশ ও তন্ত্রসাধনা–অনেকেই বলেন, তন্ত্রের উৎপত্তিস্থান গৌড়বঙ্গভূমি, 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা।' উক্তিটিকে সত্য মনে করিবার কারণও আছে। বাঙালী মা-পাগল জাতি। মাতৃ উপাসনা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত থাকিলেও উহা এই দেশেরই একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর দীক্ষা, পূজাঅর্চনা, আচার-আচরণ ও লোকব্যবহার তন্ত্রপৃষ্ট। এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ম–বৌদ্ধ সহজিয়া, নাথপন্থ, বৈষ্ণব সহজিয়া, শৈবধর্ম ও বাউল মত তন্ত্রের প্রভাবপুষ্ট। সমাজের নিম্নস্তরে তো বটেই উচ্চস্তরেও শক্তি সাধনার প্রভাব গুরুতর। পুরাণ প্রসিদ্ধ একান্নটি শাক্তপীঠের ভিতর অনেকগুলি–করতোয়া, কালীঘাট, চট্টল, বহুলা, ক্ষীরগ্রাম, ত্রিপুরা, নলহাটি, বক্রেশ্বর ও অট্টহাস প্রভৃতি বাংলাদেশে অবস্থিত। শক্তির প্রচলিত মূর্তিগুলির মধ্যে কালী বাঙালীর নিজস্ব। গ্রাম-বাংলার স্থানে স্থানে কত যে বিচিত্র শক্তি মূর্তি, কত যে বিচিত্র শাক্তপীঠ আছে, বাংলাকাব্যের 'দিগ বন্দনা' অংশে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্গভীমা, কিরীটেশ্বরী, বিশালাক্ষী, বুড়ীমা, রঙ্কিনী প্রভৃতি শক্তিদেবতা বাঙালীর শাক্তপ্রীতির পরিচয় বহন করে।

সুপ্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশ বেদাচারভ্রষ্ট মাতৃ-তান্ত্রিক মানুষের বাসস্থানরূপে পরিগণিত।

BANGLADARSHAN.COM

॥চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥পঞ্চম অধ্যায়॥

২০১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভারতের শত হিন্দুতীর্থের লেখক (সংকলন) সুতপা সুমিত দত্ত মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

এই ভারতের মাটিতেই মেলে সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন। হরোপ্পা সভ্যতার সময়কাল খ্রিষ্ট জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের পূর্বে। তবে বৈদিক যুগ বলা হয় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতককে। প্রাচীনতম বেদ ঋক বেদের সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তদশ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব একাদশ শতক। বৈদিক যুগে দেবরাজ ইন্দ্র সহ বরুণ, অগ্নিপূজা হত, সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে যজ্ঞ, কিন্তু ছিল না কোন মূর্তি বা মন্দির। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতকে এলো উপনিষদ, বলা হয় বেদান্ত তথা বেদের অন্ত বা শেষ। পরবর্তীকালে আসে রামায়ণ ও মহাভারতের মত যুগান্তকারী সংস্কৃত মহাকাব্য। রাজা মহারাজাদের বীরত্ব, কূটনীতি, যুদ্ধের সাথে ছিল বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনীও। হিন্দু ধর্মের মূল কথা ঈশ্বরের কাছে শর্তহীন আত্মনিবেদন। মূর্তিপূজা, আচার, অনুষ্ঠান, প্রাত্যহিক ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। এই ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য হল আত্মউন্নতি। ঈশ্বর সাধনার মাধ্যমে নিজেকে আবিষ্কারের সার্থকতা লাভ করা। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মে দেবত্ব ধারণার গভীর যোগ রয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতি, শিল্পকলা, পৌরাণিক কাহিনী, বিশেষত মহাকাব্য দেবতা প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে দেবতা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। রামায়ণে 'রাম' মহাভারতে 'শ্রীকৃষ্ণ' সহ বহু দেবতারা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রগুলি দেবতারূপে পূজিত হয়েছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির ভারতীয়রা দেবতা সংক্রান্ত ধারণাকে নিজস্ব পারস্পরিকতার মধ্যে গ্রহণ করেছে। হিন্দু ধর্মে আচার অনুষ্ঠান প্রাসঙ্গিক। পদ্মপুরাণ মতে সাধন প্রণালীতে মূর্তি পূজো গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকি আর্য সমাজও মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নয়। তবু হিন্দু ধর্মে মূর্তিপূজা হয়। এই মূর্তি স্থাপনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংস্কৃতি, স্থাপত্য, শিল্পকলা ও সাহিত্য। হিন্দু ধর্মে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় সাধারণ মানুষ। যেমন সূর্যোদয়ের সময় নদীতীরে গায়ত্রী মন্ত্র বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রপাঠ, এক অতি পবিত্র কাজ। যোগ সাধনা ও এক বিশেষ ক্রিয়া, এর দ্বারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে মন ও শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করা হয় বলেই ধারণা। তাই যোগ সাধনা, ঈশ্বর সাধনার এক বিশেষ প্রক্রিয়া বলেই বিবেচিত।

BANGLADARSHAN.COM

যুগ যুগ ধরে হিন্দুদের ঘরে ঘরে পূজিতা দেবী শক্তি তথা সতী। শাক্তদের প্রধান দেবী তিনি, কখনও তিনি দুর্গা, কখনও তিনি কালী, তিনিই শক্তি, তিনিই সতী। দেবী ভিন্ন ভিন্ন রূপে পূজিতা মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা শিব ও শক্তির, যিনি ব্রহ্মাকে সাহায্য করেন মহাবিশ্বের সৃষ্টিকার্যে। ব্রহ্মা স্থির করেন যে, একদিন তিনি দেবী শক্তিতে ফিরিয়ে দেবেন শিবের মধ্যে। ব্রহ্মাপুত্র দক্ষ যজ্ঞের মাধ্যমে দেবী শক্তিকে নিজকন্যা সতীরূপে আহ্বান করেন। ঠিক হয় সতী শিবজায়া রূপে ফিরে যাবেন শিবের কাছে। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ায় শিবের অভিশাপে ব্রহ্মা তাঁর পঞ্চম মাথা হারান ও স্থির হয় যে ব্রহ্মা কখনই পৃথিবীর বুকে

পূজিত হবেন না। ক্রুদ্ধ দক্ষ শিব ও সতীর বিবাহে বাধাদান করতে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনায় সতী শিবের প্রতি আকর্ষিত হন, বিবাহ হয় তাঁদের। যা দক্ষের ক্রোধ বাড়িয়ে দেয়। সত্য যুগে দক্ষ যজ্ঞের আয়োজন করেন। শিব ও সতী ছাড়া সকল দেবতাদের আহ্বান করেন তিনি। পিতা ও স্বামীর মধ্যে সম্পর্ক ভাল করার উদ্দেশ্যে সতী সেই যজ্ঞে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, অনুমতি পান শিবের। দক্ষ অনাহুত অতিথির প্রতি সঠিক ব্যবহার করেন না, সঙ্গে শিবের অসম্মান করেন। অপমানিত দক্ষজা (সতীর অপর নাম) যজ্ঞের আগুনে আত্মাহুতি দেন। ক্রোধিত শিব যজ্ঞস্থলে পৌঁছে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। যদিও ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে তা প্রতিস্থাপন করেন ছাগমুণ্ড দ্বারা। ক্রুদ্ধ শিব তারপর সতীর দেহ নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। ত্রিলোক ধ্বংসের উপক্রম হলে দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলে সতীর দেহ খণ্ডে খণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন অংশে। যে সমস্ত স্থানে এই দেহাংশ পড়েছিল, সেখানেই গড়ে ওঠে শক্তিপীঠ। প্রতিটি স্থানেই শক্তির সাথে রয়েছে ভৈরব (শিবের অন্যরূপ)।

একান্ন পীঠের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পীঠ উল্লেখ করা হইল–

স্থান	দেহাংশ/অলঙ্কার	শক্তিরূপ
অমরকণ্টক, মধ্যপ্রদেশ	বাম স্তনবৃন্ত	কালী
অমরনাথ, কাশ্মীর	ঠোঁট	মহামায়া
উজানি, গুসকরা	ডান কব্জি	মঙ্গলচণ্ডিকা
কালীঘাট	ডান পায়ের আঙুল	কালিকা
কেতুগ্রাম	বাম হাত	বাহুলা
কামাখ্যা, গুয়াহাটি	যোনি	কামাখ্যা
নলহাটি, বীরভূম	কণ্ঠনালি	কালিকা

BANGLADARSHAN.COM

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের পীঠস্থানের লেখক শ্রীকঙ্ক রায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

পিতা দক্ষ যজ্ঞ করছেন শুনে শিবজায়া সতী গেলেন পিত্রালয়ে, বিনা আমন্ত্রণে। সেখানে পতিনিন্দা শুনে দিলেন যজ্ঞানলে আত্মাহুতি। সংবাদ পেয়ে শিবানুচরগণ যজ্ঞ করলেন লণ্ডভণ্ড। শিবের নেত্রাগ্নিতে সৃষ্ট হলেন বীরভদ্র। নিহত হলেন দক্ষ তাঁর হাতে। অনন্তর দেবতাদের আবেদনে দক্ষকে পুনর্জীবিত করলেন শিব, স্কন্ধে তাঁর ছাগমুণ্ড সংযোজন করে। দক্ষ সম্পূর্ণ করলেন যজ্ঞ।

সতীর মৃতদেহ দর্শনে শোকান্মত্তে শিব শুরু করলেন প্রলয়ঙ্কর নৃত্য, সতীদেহ স্কন্ধে। দেখা দিল সৃষ্টি বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা। বিষ্ণু তখন তাঁর চক্রদ্বারা সতীদেহ করলেন খণ্ড-বিখণ্ড।

একান্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে সতীর দেহাংশগুলি যে যে স্থানে পতিত হোল সেগুলি চিহ্নিত হয়েছে মহাপীঠরূপে। প্রত্যেকটিই পরিণত পুণ্যতীর্থে। দেবী সতত বিরাজমানা এই একান্ন মহাপীঠ বা পীঠস্থানে। শিব

ও বিরাজ করছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে দেবীর ভৈরব রূপে। বিভিন্ন তন্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে এই স্থানগুলির বিবরণ। অবশ্য ঐ সকল বিবৃতির মধ্যে আছে মতানৈক্য ও বৈসাদৃশ্য।

উক্ত তন্ত্রোক্তি সমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠ নিরুপণ-এ প্রদত্ত একান্ন পীঠের বর্ণনা। প্রাণতোষিণী তন্ত্রেও রয়েছে একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া অনুরূপ উল্লেখ। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত (১৭৫২) অন্নদামঙ্গল কাব্যের পীঠমালা অধ্যায়ে আছে একান্ন পীঠের বিবরণ। শিবচরিতে রয়েছে একান্নটি মহাপীঠের ও ছাব্বিশটি উপপীঠের একটি তালিকা। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে (১৯৩৭) আছে একটি পীঠ তালিকা। একান্নটি পীঠস্থানের মধ্যে এগোরটির সন্ধান পাওয়া গেছে পশ্চিম বাঙলায়।

কেতুগ্রাম, বর্ধমান :

পীঠনির্ণয়ের দ্বাদশতম পীঠের বর্ণনা–

বহুলায়ং বাম বাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুক দেবতাস্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক:॥

পীঠের নাম বহুলা, সতীর পতিত অঙ্গ বামবাহু, পীঠদেবী বহুলা এবং ভীরুক হচ্ছেন ভৈরব।

এ সম্বন্ধে অন্নদামঙ্গলে বলা হয়েছে–

বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥

BANGLADARSHAN.COM

স্থানের নাম বহুলার বদলে হয়েছে বহুলা এবং পীঠদেবীর নাম বাহুলা চণ্ডিকা।

বহুলাই হোক আর বাহুলাই হোক কোথায় সেই পীঠস্থান? এ প্রশ্নের উত্তর আছে ‘বাংলায় ভ্রমণ’এ। উক্ত গ্রন্থানুসারে কেতুগ্রাম একটি পীঠস্থান। এই স্থানের প্রাচীন নাম বহুলা। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান অনুযায়ী বাহুলা হচ্ছে কাটোয়ার কেতুগ্রাম। ওখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে পীঠদেবী বহুলাকে। প্রায় নূতন একটি সমতল ছাদবিশিষ্ট ছোট মন্দির দেবীর অধিষ্ঠান। সম্মুখে প্রাঙ্গণ। দেবীর মূর্তি কালো পাথরে নির্মিত এবং সুদৃশ্য এক পীঠের উপর স্থাপিত। দেবী চতুর্ভুজা। মাথায় মুকুট, পিছনে কারুকার্য শোভিত চালচিত্র। দক্ষিণে গণেশ, বামে লক্ষ্মী। দেবীর মূর্তি সুদৃশ্য কিন্তু ডানদিকের একটি হাত ভাঙা। মুখ ভিন্ন মূর্তির সমস্ত অঙ্গই কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়। কেউকেউ দেবীকে বলেন বহুলাক্ষী।

নিত্যসেবা হয়। দুর্গাপূজাই দেবীর সবচেয়ে বড় পূজা। সেই সময় বহু ছাগ এবং মহিষ বলিদান হয়।

দেবীর ডাইনে অপর একটি বেদীতে একটি গণেশ মূর্তি আছে। মূর্তিটি অষ্টভূজ।

কাটোয়া থেকে কেতুগ্রাম যাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। অজয় নদের উপর কাশীরাম দাস সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে কাটোয়া থেকে স্থানটির দূরত্ব মাত্র সতেরো কিলোমিটার। বাসে-এ গিয়ে কেতুগ্রামের মোড় থেকে সাইকেল রিক্সায় যাওয়া যায়। কাটোয়া-আহমদপুর ছোট লাইনের ট্রেনেও কেতুগ্রাম যাওয়া যায়। কাটোয়া থেকে তেরো কিলোমিটার দূরের পাঁচুণ্ডী স্টেশনে নামতে হয়। স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই পীচ ঢালা রাস্তা। সেখান থেকে সাইকেল রিক্সায় দেবী মন্দির।

কাটোয়া শহরে থাকা সুবিধাজনক। একাধিক হোটেল আছে। থাকার ব্যবস্থা করতে হয় কাটোয়াতে।

২০০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রতিমা শিল্পে দেবদেবীর লেখক কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশের ঐতিহ্যে পশুদের দুঃখকষ্টে বিচলিত হয়ে তাদের রক্ষয়িত্রী রূপে তিনি স্বর্ণগোধিকার রূপে আবির্ভূতা এবং চণ্ডীমঙ্গল-এর উপাখ্যানে ব্যাধযুবক কালকেতুকে বরদানের জন্য ওই একই রূপে দেখা দিয়েছিলেন। এই উপাখ্যানেই আছে কালকেতুর বাড়িতে গোধিকারূপিনী চণ্ডী (দুর্গা, গৌরী বা পার্বতীর অন্য নাম) প্রথমে ষোড়শী বামা ও পরে মহিষমর্দিনীর রূপ ধারণ করেছিলেন।

প্রথমটি মুর্শিদাবাদ জেলার বীরপুর থেকে পাওয়া, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহালয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই দৃষ্টান্ত সমপদভঙ্গিতে দাঁড়ানো দেবীর ললাটে ত্রিনয়ন, মাথায় জটামুকুট, চার হাতের উপরের ডান ও বাম হাতে যথাক্রমে শলাকা ও দর্পণ (ক্ষতিগ্রস্ত), স্বাভাবিক ডান হাতে ফল এবং বাম হাত স্কন্ধের উপরে রাখা গণেশ আছেন তাঁর দক্ষিণে, দু-হাতের ডানটি পরশুর উপরে, বামটিকে মোদকভাণ্ড, স্কন্ধের বাম হাত কোমরে, ডান হাতে শক্তি, পাদপীঠের বামদিকে গোধিকা, ডানদিকে নতজানু ভক্ত, মূর্তির উৎসর্গকারী। দ্বিতীয় উদাহরণটি আছে বরেন্দ্র বিসার্চ মিউজিয়ামে আগেরটির মতোই দেখতে, কিন্তু পাদপীঠে উৎকীর্ণ অভিলেখটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে দেবীর নাম রয়েছে ('রাজ্ঞী শ্রীগীতা ললিতা' অর্থাৎ দেবীর নাম ললিতা এবং প্রতিমাটি শ্রীগীতা নামে কোনো রাজমহিষীর দান)। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত নিদর্শনটি শিল্পশৈলীর বিচারে দ্বাদশ শতাব্দীর, কিন্তু এতে দেবীর তৃতীয় নয়নটি একটু ভিন্ন ধরণের, তিলকের মতো উপস্থাপিত।

ললিতা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শান্ত রূপের এই দেবী প্রধানত বঙ্গদেশে (অবিভক্ত) অর্চিত হতেন, কারণ এ পর্যন্ত যে-কটি ভাস্কর্য-নিদর্শন পাওয়া গেছে, একটি বাদে সব-কটিই উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের, ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের প্রাপ্তিস্থান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম, ফলে সব মিলিয়ে ললিতাকে বিশেষভাবে বঙ্গীয় দেবী বললে ভুল হবে না। ললিতার সমগোত্রীয় আর-এক দেবীর নাম সিদ্ধা, তিনিও অগ্নিপূরাণ-এ (৫০) উল্লিখিত, কিন্তু হয়শীর্ষে অনুপস্থিত।

BANGLADARSHAN.COM

॥পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥ষষ্ঠ অধ্যায়॥

মন্দির তৈয়ারীর কাহিনী

বাংলার ১৩২৯ সালের পূর্ব্বে উক্ত স্থানে যে ‘বহুলা’ দেবীর মন্দির ছিল, সে সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার–

বাংলার ১৩২৫ সালে সাহিত্য সংহিতা পত্রিকায় ৭ম খণ্ড, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র (১০ম-১২শ সংখ্যায়), মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত ‘সাহিত্য-সংহিতা’ পত্রিকায় ‘বহুলা’ দেবীর মন্দির সম্পর্কে যাহা লেখা আছে তাহা এইখানে উল্লেখ করা হইল–

বর্তমান সেবাইতগণের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। বহু পূর্ব্বে যে মন্দির ছিল তাহা নষ্ট হইলে সেবাইতগণ মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাও বহুকাল ও বহু বহু জীর্ণ সংস্কার হইয়া এক্ষণে এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে যে নূতন মন্দির না হইলে আর সংস্কার চলিবে না, দরজা জানালা সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে গৃহ ভিত্তির খিলানাদি এবং ঘরের মেঝে পর্য্যন্ত এরূপভাবে ফাটিয়া গিয়াছে যে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে ভয় হয় পাছে মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। মন্দিরের এমত শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের ৫১ পীঠের মধ্যে ‘বহুলা’ একটী প্রসিদ্ধ পীঠস্থান, এখানে দেবীর বামবাহু পড়িয়াছিল।

BANGLADARSHAN.COM

দৃষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাৎ।
বহুলাহ্যা গতা তুর্নং প্রস্থং মানসভূভূতঃ॥
প্রত্যহং তত্রং সাবিত্রী গায়ত্রী বহুলা তথা।
সরস্বতী চ দ্রুপদা পঞ্চৈতা মানসাচলে॥

(কালিকাপুরাণ)

দেবী বহুলা বা বহুলাক্ষী নামে প্রসিদ্ধ, স্থানটির নাম বহুলাপুর এবং জমিদারি পত্তনি তালুক লাট বহুলাপুর বলিয়া পরিচালিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মন্দির প্রস্তুতের জন্য কেহই মনোযোগ করিতেছেন না। সেবাইগণের অবস্থা ভাল নহে যে, তাঁহারা এই মন্দির প্রস্তুত করেন। সন্ধানে জানিলাম এই গ্রামের ভূমধ্যাধিকারী বর্দ্ধমানাধিপ, তাঁহার অধীনে গ্রামস্থ ২/৩ জন পত্তনিদার আছেন তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য হওয়াও সুকঠিন। আমরা প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার দিকে কীর্ত্তিমান কৃতবিদ্য হৃদয়বান শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমানাধিপতির কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তিনি একটু কৃপাদৃষ্টি করিলেই এই মন্দিরটির নির্ম্মাণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দু জাতির একটী লুপ্ত প্রায় প্রসিদ্ধ তীর্থের পুনোরুদ্ধার হয়। হিন্দু সন্তানগণ নানা বিষয়ে অধঃপতিত হইলে ও তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র মধুর ধর্ম্মভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মাত্রেরই এই শুভ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। পল্লীগ্রামে একটী এরূপ কুঠারি প্রস্তুত করিতে হাজার টাকার

উর্দ্ধ খরচ হইবে না। আমরা সেখানকার সেবাইত শ্রীযুক্ত কুমারিশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের দ্বারা যথা সাধ্য পূজাদি করাইলাম। লোকটি সদাশয় এবং সরল প্রকৃতির, তিনি এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য আমাকে সচেষ্টিত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আমাদের তথায় থাকিয়া আহারাদির জন্য আগ্রহ করিলেন।

(ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ৩/১/৩এ আনন্দ লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা)

বাংলার ১৩২৯ সালের মন্দির তৈয়ারীর পূর্ব্বে যে "পীঠমালারবচন" নামক একটি আবেদন পত্র ছাপানো হইয়াছিল, উক্ত আবেদন পত্র এখানে উল্লেখ করা হইল–

"ঁশ্রীশ্রীবহুলা শরণম্" "পীঠমালারবচন"

"বহুলায়াং বামবাহুর্ব্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"

জেলা বর্দ্ধমান ই, আই, রেল স্টেশন কাটোয়ার তিনক্রোশ উত্তর পশ্চিমাভিমুখে এবং আহম্মদপুর কাটোয়া রেলের পাঁচন্দী নামক স্টেশন হইতে একমাইল দক্ষিণে মহাপীঠ কেতুগ্রাম, পট্টি বহুলাপুর মধ্যে পাড়া 'বহুলা' নামক স্থানে সতী অঙ্গ বামবাহু পতিত হয়, তথায় মায়ের বিশাল মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী (শ্রীশ্রীঁবহুলা, বহুলাখ্যার অপভ্রংশে প্রকাশ বহুলাক্ষী) দেবীর প্রকাণ্ড নয়ন মন-মুগ্ধকর পাষাণ মূর্ত্তি অবস্থিত। উক্ত মন্দিরাদি বহুকালের নির্ম্মিত, পুনঃ পুনঃ সংস্কার সত্বেও উপস্থিত মন্দিরাদি এরূপ জীর্ণ ও ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে অন্যুন দুই হাজার টাকার কমে তাহার সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। মন্দিরটি এরূপ ভগ্নাবস্থা হইয়াছে যে মহাদেবীকে উক্ত মন্দির হইতে সরাইয়া নিকটস্থ একখানি খেরী চালাঘরে রাখা হইয়াছে। উক্ত গ্রামে তাদৃশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি না থাকায় সাধারণের সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র সেবাইতগণের দ্বারা এরূপ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব। অতএব স্বধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য দানে উক্ত ভগ্ন মন্দিরাদির সংস্কার কল্পে উৎসাহ দান করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির একটী প্রসিদ্ধ পীঠস্থান রক্ষা করুন। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা প্রেরিত চাঁদার বইতে স্বাক্ষর করিয়া ধর্ম্মানুরাগী প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র রায় সেবাইতকে দিবেন এবং নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার তীর্থসেবী ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্য তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিনীত নিবেদক–

মালিক সেবাইত, শ্রীকুমারীশ চন্দ্র দেব শর্ম্মণ (দিগর) সাং–কেতুগ্রাম বহুলাপুর, বহুলাপাড়া, পোষ্ট–কেতুগ্রাম, জেলা–বর্দ্ধমান।

BANGLADARSHAN.COM

ঠিকানা–

বহরমপুরের মাননীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের ভ্রাতা হাইকোর্টের উকিল ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, ৭৬ নং মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা। ইডেন হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব হাউসসার্জ্জন ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় এল. এম. এস, ৪৮ নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩/১/৩এ আনন্দ লেন, কলিকাতা।

মালিক সেবাইত শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায়, কেতুগ্রাম, বহুলাপাড়া, পোষ্ট–কেতুগ্রাম, জেলা–বর্দ্ধমান।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় 'বহুলা' দেবীর গৃহাদি কার্য্য তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের ছাদের জন্য টালিগুলি উদ্ধারণপুর হইতে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হঠাৎ বাংলার ১৩২৮ সালে ৮ই পৌষ শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় পরলোক গমন করেন।

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় পরলোক গমন করার ফলে 'বহুলা' দেবীর গৃহাদি, প্রাচীর নহবৎখানা ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য কেতুগ্রাম নিবাসী শ্রীফণীন্দ্র ভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ঠিকাদারী দেওয়া হইয়াছিল ১৩২৮ সালে।

"বহুলাক্ষী মাতা"

(বাম বহুলা) দেবীর মন্দির লালগোলাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় মহোদয় বাহাদুরের অর্থ সাহার্য্যে এবং আলমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ সেন বরাট মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় এই মন্দির নির্ম্মিত হইল।

BANGLADARSHAN.COM

"সন–১৩২৯ সাল"

ইহার বেশ কিছু বছর পর মন্দিরটি ফাটিয়া যায় এবং চারিদিকের প্রাচীর ও নহবৎখানাও ভাঙ্গিয়া যায়।

উক্ত সময়ে শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র রায় মহাশয় 'বহুলা' দেবীর নূতন মন্দির তৈয়ারীর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু সেবাইতগণের অসহযোগীতার জন্য মন্দির তৈয়ারী করিতে পারেন নাই।

তাহার পর শ্রীহরিহর নাথ রায় মহাশয় 'বহুলা' দেবীর মন্দির তৈয়ারীর জন্য গ্রামের বেশ কিছু যুবককে লইয়া নূতন মন্দিরের জন্য ভীত খনন করিয়াছিলেন ও মন্দির তৈয়ারীর জন্য ইঁট তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তথাপি কিছু সেবাইতগণের অসহযোগীতার জন্য মন্দির তৈয়ারী করিতে পারেন নাই।

তারপর আবার শ্রীসুশীল চন্দ্র রায় মহাশয় 'বহুলা' দেবীর নূতন মন্দির তৈয়ারীর জন্য কলিকাতা হইতে সর্ব্বশ্রী দেবী প্রসাদ পালধী মহাশয় সহ বেশ কিছু ভক্ত ও ঐ সময়কার অমৃত বাজার পত্রিকার এডিটর মহাশয়কে লইয়া কেতুগ্রামে 'বহুলা' দেবীর পূজা ও মন্দিরের কী পরিস্থিতি তাঁহাদের দেখানো হইয়াছিল। ঐ সকল ব্যক্তিগণ মন্দির তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কেতুগ্রামের কিছু ব্যক্তি, ওনাদের নানাভাবে মন্দির তৈয়ারী না করেন তার জন্য নানারূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। সেই জন্য মন্দির তৈয়ারী করিতে পারেন নাই।

পুনরায় আবার শ্রীঅকুল চন্দ্র রায় ও শ্রীমুক্তি পদ দে এই দুইজনে কেতুগ্রামের জনসাধারণ ও সেবাইতগণকে উপস্থিত করিয়া 'বহুলা' দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভার আয়োজন করিয়াছিলেন,

‘বহুলা’ দেবীর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করার উদ্দেশ্যে এবং ঐ সভায় উক্ত গ্রামের স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেক্ষেত্রে সেবাইতগণের মধ্য হইতে কিছু সেবাইত বলিয়াছিলেন যে জনগণেরও বেশ কিছু সেবাইত উক্ত সভা হইতে চলিয়া যান এবং মন্দির তৈয়ারীর পরিকল্পনা নষ্ট হইয়া গেল।

পূর্বতন মহোদয়গণ বাংলার ১৩২৯ সালের তৈরী মন্দিরটি যখন ফাটিয়া ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তখন নূতন মন্দির তৈয়ারী করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও নানা বাধার জন্য মন্দির তৈয়ারী করিতে পারেন নাই।

<u>সতীপীঠস্থান ‘বহুলা’ দেবীর মন্দিরে কেতুগ্রামের যুবকগণের প্রবেশাধিকার ও মন্দির নির্ম্মাণ কাহিনী–</u>

বাংলার ১৩৭৪ (ইংরাজি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ), এই সময় সকলের মনে একটাচিন্তা কীরূপে সতীপীঠ ‘বহুলা’ দেবীর ভাঙ্গা মন্দির সংস্কার করা যায়। ‘বহুলা’ দেবীর ইচ্ছেয় ভক্তগণের ও জনসাধারণের চেষ্টায় একটি ১০ (দশ) পয়সার লটারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে ‘বহুলা’ দেবীর মন্দির সংস্কার কল্পে। এই লটারীর ব্যবস্থাপনা করিয়াছিলেন যাহারা, তাহাদের নাম এইস্থানে উল্লেখ করা হইল–সর্বশ্রী ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী, দীনবন্ধু দে, অসীম কুমার রায়। এই তিনজন যুবকের আন্তরিকতা ও প্রাণপণ চেষ্টার ফলে উক্ত লটারী হইতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল ৩৩ (তেত্রিশ) টাকা ৩৭ (সাইত্রিশ) পয়সা।

উক্ত যুবকগণ ঐ টাকা ও পয়সা লইয়া কাজ করিবে ঠিক করিবার জন্য উহাদের সকল বন্ধুদের ডাকিয়া অসীম কুমার রায়ের বাড়িতে একটি সভার আয়োজন করিয়াছিল। উক্ত সভায় যোগদানকারী সকলের নাম দেওয়া হইল–সর্বশ্রী রণজিৎ কুমার সেন, সনাতন দে, ধনঞ্জয় সাহা, মৃত্যুঞ্জয় সেন, ব্রহ্মানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু দে, মধুসূদন দে, ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী, অসীম কুমার রায়।

BANGLADARSHAN.COM

১৫/০৮/১৩৭৪ তারিখের সভায় উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ‘বহুলা’ দেবীর ভাঙ্গা বা ফাটিয়া যাওয়া মন্দিরটিকে মেরামৎ করা হইবে।

ঐ সময়ে কাঠের মিস্ত্রি শ্রীরাধা বিনোদ ভাস্কর ও রাজমিস্ত্রি মেটিয়ারী নিবাসী শ্রীমন্টু কুমার দত্ত মহাশয়গণের সহযোগিতায় আমরা এই কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই কাজের জন্য শ্রীঅকুল চন্দ্র রায় মহাশয় কাঁচরাপাড়া হইতে সিমেন্ট সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী মহাশয় কাঁচরাপাড়া হইতে সিমেন্টগুলি কেতুগ্রাম লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শ্রীমতী ক্ষুদি মুখার্জী মহাশয়া কিছু লোহার শিক দিয়াছিলেন ও গ্রাম্যজনসাধারণ কেহ বালি, কেহ শ্রম, সেবাইতরা কেহ কেহ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমরা মন্দিরটি সংস্কার এবং রং করা হইয়াছিল।

খুবই দুঃখের বিষয় যে ১৩৭৫ সালের বৈশাখ মাসে দেখা গেল সংস্কার করা মন্দিরটি পুনরায় আবার ফাটিয়া গিয়াছে। তখন ‘বহুলা’ দেবীকে অন্যত্র সরাইয়া মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া নূতন মন্দির তৈয়ারীর পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।

১৩৭৫ সালে ২৬শে বৈশাখ ‘বহুলা’ দেবীকে মন্দিরের নিকটে একটি খেরী চালাঘরে রাখা হইয়াছিল।

পুনরায় উক্ত যুবকগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া মন্দিরটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, সেক্ষেত্রে সেবাইতগণের ও গ্রামস্থ জনসাধারণের অনুমতির প্রয়োজন দরকার।

১৩৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীক্ষুদিরাম চক্রবর্তী ও শ্রীঅসীম কুমার রায় বেহালায় (কলিকাতা) গিয়া ডাঃ দীনেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত 'বহুলা' দেবীর গৃহাদি নির্ম্মাণের বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল এবং কমিটিতে কোন কোন ব্যক্তিগণকে লওয়া হইবে যে, সে বিষয়ে দীনেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত আলোচনা করা হইয়াছিল। উনি যাহা বলিয়াছিলেন আমরা তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব এই কথা বলিয়া বেহালা হইতে কেতুগ্রাম চলিয়া আসিয়াছিলাম।

তাহারপর আমরা আরও দুইজন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করি, উক্ত ব্যক্তিদের নাম শ্রীঅকুল চন্দ্র রায় ও শ্রীঅনিল কুমার রায়। উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সঙ্গে সকল বিষয় আলোচনা করিবার পর ওনারা বলিলেন যে তোমরা আর দেরি না করিয়া কাজে নিযুক্ত হও।

ইহার পর ১৩৭৫ সালের শ্রাবণ মাসে কার্ড ছাপাইয়া ভাদ্র মাস হইতে সেবাইতগণ ও গ্রামস্থ জনসাধারণকে কার্ডদ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল ও একটি সভার আয়োজন করিবার প্রয়োজনে।

১৩৭৫ সালে ১২ই আশ্বিন তারিখে বৈকাল ৪ ঘটিকায় 'বহুলা' দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে একটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সেবাইতগণ ও গ্রামস্থ জনসাধারণ যুক্তভাবে সভায় মিলিত হইয়া সকলে সর্বসম্মতি ক্রমে মন্দির ভাঙ্গিয়া নূতন মন্দির তৈয়ারী করিবার অনুমতি প্রদান করেন। সকলে বলিলেন যে অর্থ, শ্রম, গাড়ি দান ও সকলে যে যেভাবে পারিবে সাহায্য করিবেন।

উক্ত সভায় কমিটির নাম করণ করা হইল, শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী ভগ্ন মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণ কমিটি।

BANGLADARSHAN.COM

উক্ত সভায় আরও স্থির হইল যে সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সভ্যগণ ও কর্মীগণের নাম নির্বাচিত ও সমর্থিত হইল।

ঐ দিনের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীকুমুদ কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। কেতুগ্রাম/বর্ধমান।

এইস্থলে সভাপতি হইতে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হইল–

ক) সভাপতি–সর্বশ্রী অনাদিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়–বিল্লেশ্বর।

খ) সহ-সভাপতি–সর্বশ্রী কুমুদ কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়–কেতুগ্রাম।

গ) কোষাধ্যক্ষ–সর্বশ্রী বিভূতি ভূষণ স্বর্ণকার–লাভপুর।

ঘ) সহ-কোষাধ্যক্ষ–সর্বশ্রী অসীম কুমার রায়–কেতুগ্রাম।

ঙ) কর্মানুষ্ঠান–সর্বশ্রী হরিহর নাথ রায়–কেতুগ্রাম।

চ) সহ-কর্মানুষ্ঠান–সর্বশ্রী মুক্তিপদ দে–কেতুগ্রাম।

ছ) রক্ষণাবেক্ষণকারী–সর্বশ্রী নারায়ণ চন্দ্র দে–কেতুগ্রাম।

জ) সম্পাদক–সর্বশ্রী অম্বুজাক্ষ দত্ত–বিল্লেশ্বর।

ঝ) সহ-সম্পাদক–সর্বশ্রী অম্বিকাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়–কেতুগ্রাম।

২৬/১২/১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীক্ষুদিরাম চক্রবর্তী ও শ্রীরক্ষাকর সেন, এই দুজনে 'বহুলা' দেবীর মন্দির ভাঙ্গার কাজ ছাদ হইতে শুরু করেন, যেমন ইঁট ভাঙ্গা শুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষধর সাপ ওনারা

দেখিতে পান এবং ওনারা তৎক্ষণাৎ কাজ বন্ধ করিয়া চলিয়া আসেন শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী রায় (অসীম রায়ের মাতা) মহাশয়ার নিকট এবং সকল ঘটনা তাঁহাকে ব্যক্ত করেন এবং ইহা শুনিয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী রায় কাজ বন্ধ করিবার কথা বলেন।

২৭/১২/১৯৬৮ তারিখ হইতে শ্রীঅসীম কুমার রায় সহ ঐ দুজনে মন্দির ভাঙ্গার কাজ পুনরায় আরম্ভ করেন, তাহার পর হইতে আর কোনদিন ঐরকম দৃশ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

তাহার পর হইতে ২৪ ঘণ্টাব্যাপি কাজ করিতেন যে সকল কর্মী তাহাদের নাম এস্থলে উল্লেখ করা হইল–শ্রীক্ষুদিরাম চক্রবর্তী, শ্রীরক্ষাকর সেন, শ্রীব্রহ্মচরণ সাঁই (পেঙ্গল সাঁই), শ্রীপ্রশান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীদেবদাস সেন ও শ্রীঅসীম কুমার রায়। ইহা ছাড়াও কেতুগ্রামের যুগকগণ মন্দির ভাঙ্গা ও নানা ধরণের কাজ করিতেন, তাহাদের সকলের নাম এখানে দেওয়া সম্ভবপর হইল না তাহার জন্য আমরা দুঃখিত।

আবার বেশ কিছু কর্মী ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা করিত মন্দির নির্ম্মাণ কল্পে, তাহাদের নাম–শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রীজয়দেব সেন, শ্রীমহেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতামাল চন্দ্র সেন, শ্রীসন্তোষ কুমার রায়, শ্রীগুরুপদ দে, শ্রীব্রহ্মানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সেন ও শ্রীঅসীম কুমার রায়।

ইহা ছাড়া আরও দুইজন কর্মী গরুর গাড়ি লইয়া বালি, সিমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী আনিবার ব্যবস্থা করিতেন, উহাদের নাম–শ্রীহৃদয় কুমার সেন ও শ্রীগোলোক বিহারী সেন।

০২/০৫/১৯৬৯ তারিখে বৈকাল ৫ ঘটিকায় কেতুগ্রাম সাবরেজিষ্টার অফিসের সাবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বিভাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে 'বহুলা' দেবীর ভগ্ন মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণ কমিটির সভাপতি হইতে সভ্যগণ ও কর্মীগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

ঐদিন সভাপতি মহাশয় সকল কর্মীগণকে ও সকল সদস্যগণকে বলিয়াছিলেন যে শারদীয়া দুর্গা পূজার পূর্বে মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

'বহুলা' দেবীর মন্দিরের ছাদ তৈয়ারীর সময়, 'বহুলা' দেবীর ভগ্ন মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণ কমিটির নিকট অর্থ না থাকার জন্য বোধয় শারদীয়া দুর্গাপূজার পূর্বে মন্দির তৈয়ারীর কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিতেছে না, তাই আপাতত কাজ বন্ধ রহিল।

'বহুলা' দেবীর ইচ্ছায় ও করুণায়, ঐ সময় শ্রীহৃদয় কুমার সেন ও শ্রীসনাতন দে মহাশয়রা শ্রীঅসীম কুমার রায়কে বলিলেন যে, অর্থের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। আমরা আমাদের স্ত্রীর গহনা বিক্রি বা মরগেজ রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিব এবং দুর্গাপূজার পূর্বে মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

ঐ দুইজন সহৃদয় ব্যক্তি শ্রীতারাপদ রুদ্র মহাশয়ের নিকট হইতে ৫০০ টাকা ধার করিয়া লইয়া আসিলেন ও শ্রীতারাপদ রুদ্র মহাশয়কে ৬ মাসের মধ্যে ফেরৎ দিতে হইবে এই চুক্তিতে ধার করিয়া আনিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া আরও একজন ব্যক্তি শ্রীমতী ফুদী মুখার্জী মহাশয়ার নিকট হইতে এক কুইণ্টাল চৌত্রিশ কেজি শিক বা লোহার রড ধার পাওয়া গিয়েছিল। উক্ত শিক ধার পাওয়ার জন্য যে সকল কর্মীগণ ওনার নিকট গিয়াছিলেন তাহাদের নাম–শ্রীহৃদয় কুমার সেন, শ্রীসনাতন দে ও শ্রীক্ষুদিরাম চক্রবর্তী। সকলের

চেষ্টার জন্য ইহা সম্ভব হইয়াছিল, এবং ওনার যখন প্রয়োজন হইবে তখন ওনার শিক ফেরৎ দেওয়া হইবে এই অঙ্গিকার বা চুক্তি করিয়া ধার লওয়া হইয়াছিল।

উক্ত ব্যক্তিগণের প্রাণপণ চেষ্টা ও সহযোগিতার জন্য ‘বহুলা’ দেবীর মন্দিরের কাজ শেষ করিতে পারিয়াছিলাম।

‘বহুলা’ দেবীর নূতন মন্দির তৈয়ারীর জন্য সেবাইতগণ, গ্রামস্থ জনসাধারণগণ ও নানা প্রান্ত হইতে ও ভক্তগণের অর্থ সাহায্যে এবং কেতুগ্রামের জনসাধারণের শ্রমদান ও যান বাহন দান ও কেতুগ্রামের যুবকগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও সহযোগিতায় ‘বহুলা’ দেবীর ভগ্ন মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণ কমিটির সভাপতি হইতে কর্মীগণের যত্ন ও চেষ্টায় ‘বহুলা’ দেবীর নূতন মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল।

‘বহুলা’ দেবীর মন্দিরের চারিদিকের প্রাচীর, ভোগঘর ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিবার জন্য পুনরায় কেতুগ্রামের যুবকগণ ‘বহুলা’ দেবীর মন্দিরে কাজের জন্য অগ্রসর হইলেন।

‘বহুলা’ দেবীর মন্দিরের কাজ শেষ হইবার বেশ কিছু মাস পরে শ্রীঅসীম কুমার রায়ের পরিচালনায় আবার কেতুগ্রামের যুবকগণ ও সেবাইতগণের কিছু যুবক নিজেরা ইঁট তৈয়ারী করিয়াছিল। উক্ত ইঁট বিক্রি করিয়া ঐ বিক্রিত অর্থ হইতে ‘বহুলা’ দেবীর মন্দিরের পিছনের দিকের প্রাচীর ও পশ্চিমদিকে তিনটি ঘরের বেশ কিছু গাঁথনির কাজ করা হইয়াছিল। কিন্তু বাকী কাজগুলি শেষ করিতে পারে নাই।

আবার বেশ কিছু মাস পরে দেখা গেল যে ঐ তিনটি ঘরের গাঁথনির ইঁটগুলি কিছু ব্যক্তি খুলিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং ইহাতে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে।

BANGLADARSHAN.COM

পুনরায় বাংলার ১৩৮৬ সালের ১৫ই আশ্বিন ‘বহুলা’ দেবীর মন্দিরে একটি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে স্থির হয় যে পুরাতন কমিটি ভাঙ্গিয়া বা বাতিল করিয়া নূতন কমিটি তৈয়ারী করিতে হইবে, এবং ঐ কমিটির নাম দেওয়া হইবে শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী পূজা পরিষদ।

শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী পূজা পরিষদের সভাপতি হইতে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হইল।

ক) সভাপতি–সর্বশ্রী শিবনারায়ণ রায়–কেতুগ্রাম।

খ) সহ-সভাপতি–সর্বশ্রী অসিত কুমার রায়–কেতুগ্রাম।

গ) কোষাধ্যক্ষ–সর্বশ্রী মহেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়–কেতুগ্রাম।

ঘ) সহ-কোষাধ্যক্ষ–সর্বশ্রী সুজয় কুমার রায়–কেতুগ্রাম।

ঙ) সম্পাদক–সর্বশ্রী অসীম কুমার রায়–কেতুগ্রাম।

চ) সহ-সম্পাদক–সর্বশ্রী অমরেশ কুমার রায়–কেতুগ্রাম।

উক্ত সভায় আরও স্থির হয় যে উপরোক্ত পূজা পরিষদকে প্রয়োজনমতো সুপরামর্শ দিবার জন্য পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হইল, এবং পরিচালক মণ্ডলীর নাম নিম্নে দেওয়া হইল–

ক) সর্বশ্রী হরিহর নাথ রায়–কেতুগ্রাম।

খ) সর্বশ্রী গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়–কেতুগ্রাম।

গ) সর্বশ্রী হারাধন রায়–কেতুগ্রাম।

ঘ) সর্বশ্রী ধরাধর চট্টোপাধ্যায়–কেতুগ্রাম।

ঙ) সর্বশ্রী বামাপদ রায়–কেতুগ্রাম।

শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী পূজা পরিষদের পরিচালনায় ঠাকরুণ গড়িয়া, শিকদাগর ও অর্জুন সাগর তিনটি পুকুর পরিষ্কার করিয়া মাছের চাষ করিবার পরিকল্পনা করা হইল। ঠাকরুণ গড়িয়া পুকুরে মাছ ফেলিয়াছিলেন শ্রীবিলন চন্দ্র চন্দ ও শ্রীমহেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ, কিন্তু অন্য পুকুর দুটিতে মাছের চাষ করিতে পারে নাই।

ঠাকরুণ গড়িয়া পুকুর হইতে রাত্রিতে মাছ ধরিয়া উক্ত মাছ কাটোয়ার বাজারে বিক্রি করিবার জন্য পাঠানো হইত। রাত্রিতে মাছ ধরার জন্য যাহারা সহযোগিতা করিতেন তাহাদের নাম–শ্রীঅমরেশ কুমার রায়, শ্রীঅজয় কুমার রায়, শ্রীমহেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুজয় কুমার রায়, শ্রীপঞ্চানন দে, শ্রীঅসীম কুমার রায় ও শ্রীসনাতন দে মহাশয়গণ। রাত্রিতে মাছ ধরিবার পর উক্ত মাছগুলি কাটোয়ার বাজারে বিক্রি করিবার জন্য পাঠানো হইত এবং উক্ত মাছগুলি বিক্রয় করিয়া ধার শোধ ও বাকী কাজগুলি সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

মাছ বিক্রির অর্থ হইতে শ্রীমহেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহৃদয় কুমার সেন, শ্রীজয়দেব চন্দ্র চন্দ, শ্রীসনাতন দে ও শ্রীঅসীম কুমার রায় মহাশয়গণ কাটোয়া হইতে রড বা শিক কিনিয়া আনিয়া শ্রীমতী ফুদী মুখার্জী মহাশয়ার নিকট যে রড বা শিক ধার করা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা উক্ত ধার করা রড বা শিক পরিশোধ করা হইল।

BANGLADARSHAN.COM

ইহার পর আবার 'বহুলা' দেবীর গৃহাদি কাজে নানা ভাবে বাধা দেওয়ার জন্য কেতুগ্রামের যুবকগণ পুনরায় ডাঃ দীনেশ চন্দ্র রায়, শ্রীঅকুল চন্দ্র রায় ও শ্রীঅনিল কুমার রায় মহাশয়গণের সহিত সকল বিষয় আলোচনা করেন এবং ওনারা বলিলেন যে শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী পূজা পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নূতন কমিটি গঠন করার পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং "বহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ড" গঠন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ঐ সময় "বহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ড" গঠন করিতে পারি নাই। পুনরায় আবার পরিষদ গঠন করা হইয়াছিল।

বাংলার ১৮ই আশ্বিন ১৩৯১ (০৫/১০/১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) সালে বৈকাল তিন ঘটিকায় 'বহুলা' দেবী মন্দিরে একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল, উক্ত সভায় সকল সেবাইতগণ ও গ্রামস্থ জনসাধারণ যুক্তভাবে আলোচনা করিয়া সকলের সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী পূজা পরিষদ গঠন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী পূজা পরিষদকে চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে–

পরিচালন সমিতি–

॥প্রথম পর্ব॥

ক) সভাপতি–সর্বশ্রী গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়–কেতুগ্রাম।

খ) সহ-সভাপতি–সর্বশ্রী শিব নারায়ণ রায়–কেতুগ্রাম।

গ) কোষাধ্যক্ষ–সর্বশ্রী হারাধন রায়–কেতুগ্রাম।

ঘ) সহ-কোষাধ্যক্ষ–সর্বশ্রী বাণেশ্বর রায়–কেতুগ্রাম।

ঙ) সম্পাদক–সর্বশ্রী বঙ্কিম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চ) সহ-সম্পাদক–সর্বশ্রী অকুল চন্দ্র রায়–কেতুগ্রাম।

এখানে দ্বিতীয় পর্ব–কার্যকরী সমিতি, তৃতীয় পর্ব–সভ্যবৃন্দগণ, চতুর্থ পর্ব–কার্যকরী সমিতির সদস্যগণের নাম উল্লেখ করিতে না পারার জন্য দুঃখিত।

শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবীর পূজা পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়গণ 'বহুলা' দেবীর প্রাচীর, ভোগঘর ও অতিথিশালা ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য রসিদ বই ও আবেদন পত্র ছাপাইয়া চাঁদা বা সাহায্য সংগ্রহ করিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

৩০/০৩/১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শ্রীদিলীপ কুমার দে ও শ্রীঅসীম কুমার রায়, 'বহুলা' দেবীর প্রাচীরের ভীত কাটিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পর হইতে গ্রামস্থ যুবকগণ উক্ত কাজে সকলে ঝাপাইয়া পড়িলেন। উক্ত সময় হইতে সকল যুবকগণ যে যে ভাবে পারে সে সেভাবে এই কাজে সহযোহিতা করিতে লাগিলেন। এইস্থলে সকল যুবকগণের ও কর্মীগণের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর হইল না তার জন্য আমরা দুঃখিত।

হঠাৎ ঐ সময়ে আসানসোল হইতে শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায় মহাশয় কেতুগ্রাম বাড়ি আসিলেন। শ্রীবঙ্কিম রায় বাড়ি হইতে আসিয়া 'বহুলা' দেবীর মন্দিরে আসিলেন। তিনি মন্দিরে আসিয়া রাজমিস্ত্রিদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে এইঘরগুলি কী ছাদ হইবে না অন্য কিছু হইবে, তখন রাজমিস্ত্রি ও কিছু কর্মী বলিল যে না টালির চাল করা হইবে। ঐ সময়ে মন্দিরে উপস্থিত কর্মীগণের সম্মুখে তিনি বলিলেন যে, ছাদ করিতে কীরূপ খরচ হইবে, তখন রাজমিস্ত্রি বলিল যে, ৭ হাজার টাকার মত খরচ হইবে। তখন সকল কর্মীগণ শ্রীহৃদয় কুমার সেন, শ্রীদিলীপ কুমার দে, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সেন, শ্রীসনাতন দে, শ্রীরণজিৎ কুমার সেন ও শ্রীঅসীম কুমার রায় এবং রাজমিস্ত্রি সকলে শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায় মহাশয়কে বলিল যে, আপনি যদি টাকাটা দেন তাহলে ছাদ করা হইবে, সকলের কথা শুনিবার পর তিনি বলিলেন যে, আমি ৭ হাজার টাকা শ্রীঅসীম কুমার রায়ের নিকট কয়েক দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিব, আপনারা ছাদ ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করুন। শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায়ের নিকট হইতে অর্থ পাওয়া যাইবে শুনিবার পর সকল কর্মীগণ এবং অনেক যুবক যুবতী কাজের জন্য ঝাপাইয়া পড়িলেন।

এই সকল দৃশ্য দেখিয়া শ্রীশিব নারায়ণ রায় ও শ্রীঅসিত কুমার রায় মহাশয়গণ উক্ত কাজে উৎসাহিত ও সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং নিজেরাও সক্রিয়ভাবে কাজে যোগদান করিলেন এবং তিনটি ঘরের ছাদ ঢালাইয়ের সময় উপস্থিত থাকিয়া কাজকর্ম যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছাদ ঢালাই সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হইল।

BANGLADARSHAN.COM

ছাদ ঢালাইয়ের ছবি এখানে দেওয়া হইল–

উক্ত বছরের শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায় মহাশয় কেতুগ্রাম বাড়ি আসিলেন। বাড়ি হইতে 'বহুলা' দেবীর মন্দিরে আসিয়া শ্রীঅসীম কুমার রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উক্ত ঘরগুলির দরজা ও জানালাগুলির পাল্লা লাগানো হয় নাই কেন? শ্রীঅসীম রায় বলিলেন যে, অর্থের অভাবের জন্য আমরা কাজ করিতে পারি নাই।

BANGLADARSHAN.COM

তিনি অসীম রায়কে বলিলেন যে, তুমি কাঠের মিস্ত্রির সহিত কথা বলো, যে উক্ত কাজগুলো করিতে কত খরচ হইবে। শ্রীঅসীম রায় কাঠের মিস্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া 'বহুলা' দেবীর মন্দিরে লইয়া আসিলেন এবং কাঠের মিস্ত্রির নিকট খরচের হিসাব লইলেন। তিনটি ঘরের দরজা ও জানালাগুলির কাজ করিতে ৭ হাজার টাকা খরচ হইবে। শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায় মহাশয় অসীম রায়কে বলিলেন যে, তুমি কাজ আরম্ভ করার ব্যবস্থা কর আমি টাকা পাঠাইয়া দিব।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায় মহাশয়ের সৎচেষ্টা, সৎউৎসাহ, সৎ আগ্রহ ও আন্তরিকতা এবং সহযোগিতা সকল কর্মীগণকে যে বিরাট প্রেরণা জুগিয়েছিল। শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত সময়ে কেতুগ্রামে না আসিলে বোধহয় ঐ সকল ঘরগুলির ছাদ ঢালাই ও উক্ত ঘরগুলির দরজা ও জানালা লাগানো সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়াও শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায় মহাশয়ের অর্থে 'বহুলা' দেবীর মন্দিরের দরজা ও কোলাপসিপেল গেটটি তৈয়ারী হইয়াছিল।

সেবাইতগণ ও গ্রামস্থ জনসাধারণ এবং ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত হইতে অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য 'বহুলা' দেবীর গৃহাদি কার্য ও গ্রামবাসীদের গাড়িদান, শ্রমদান ইত্যাদির দ্বারা 'বহুলা' দেবীর মন্দিরের সকল কাজগুলি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী পূজা পরিষদের সভাপতি শ্রীগোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের, প্রথম পর্ব হইতে চতুর্থ পর্বের সকল সভ্যগণ ও সকল কর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য 'বহুলা' দেবীর মন্দিরের সমস্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বাংলার ২০শে আশ্বিন ১৩৯৯ সালে সকল সেবাইতগণের উপস্থিতিতে 'বহুলা' দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত সভায় উপস্থিত সকল সেবাইতগণ সর্বসম্মতিক্রমে একটি ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করিলেন। উক্ত ট্রাস্ট বোর্ডের নাম করণ করা হইল, "শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ড", কেতুগ্রাম, বর্ধমান।

সবশেষে শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবীর ইচ্ছায় সবই হইয়াছে, সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

BANGLADARSHAN.COM

॥ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥সপ্তম অধ্যায়॥

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বিশ্বকোষে"র প্রকাশক দীন মহম্মদ সাক্ষরতা প্রকাশনের পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

কাটোয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মহকুমা এবং মহকুমার সদর শহর, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। মহকুমার আয়তন ১০৫০ বর্গ কিমি, জনসংখ্যা ৫,৩২,৪৯৪ (১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ)।

একদা জৈন বৌদ্ধ ও তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র ছিল। মহকুমার বহু স্থানে প্রাচীন মূর্তি ও মন্দির আছে। তার মধ্যে কোগ্রামে মঙ্গলচণ্ডী ও বজ্রাসনে আসীন বুদ্ধমূর্তি।

কেতুগ্রামে দেবী বহুলার মন্দির উল্লেখযোগ্য।

১৯৮৯/৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "অভিযান গোষ্ঠী"র লিখিত পুস্তকে বর্ধমান চর্চায়, বর্ধমান গ্রাম নামের উল্লেখ করা হইল–

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কোনো না কোনো অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেবতার বাস। এই সব দেবদেবীর নামে গ্রামের নামকরণ তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। বর্ধমান জেলায় যে সব দেবদেবী সম্বন্ধীয় গ্রাম নাম আছে।

অন্যান্য দেবতার নামে গ্রামনাম ১৮টি। এর মধ্যে কিছু নাম ব্যক্তি বিশেষের ও হতে পারে।

সরাসরি ভগবানপুর, শিবপুর, বিষ্ণুপুর, ইন্দ্রপুর, ঈশ্বরপুর, নামের গ্রামনাম পাওয়া যাচ্ছে বর্ধমানে। এতো গেল দেবতাদের কথা।

BANGLADARSHAN.COM

দেবীদের নামযুক্ত গ্রামের সংখ্যা ৪৭টি। এরমধ্যে কিছু পৌরাণিক চরিত্র রয়েছেন যেমন–বহুলা, জানকী, সীতাহাটী। বাকিগুলি দুর্গা, চণ্ডী, লক্ষ্মীদের প্রভাব। সরস্বতীগঞ্জ একটি।

১৯৮৯/৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "অভিযান গোষ্ঠী"র লিখিত পুস্তকে বর্ধমান চর্চায়, বর্ধমানের আধ্যাত্মিকতার ধারার লেখক এককড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত তথ্য হইতে উল্লেখ করা হইল–

বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা, কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী, শক্তিগড়ের কালী, বড়বেলুনের বড়মা, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কালনা ও কাটোয়ার সিদ্ধেশ্বরী, তেজুগঞ্জের কালী, কেতুগ্রামের বহুলাদেবী, অট্টহাসের ও মঙ্গলগ্রামের চামুণ্ডা, দামুন্যায় কবিকঙ্কণের পূজিতা চণ্ডিদেবীর পূজার মধ্যে এই শক্তি সাধনার পরিচয় মেলে। তাছাড়া বৈশাখ মাসে হরিবাটী, নবগ্রাম, ধামাস ও প্রায় সমস্ত গ্রাম বর্ধমানে রক্ষাকালীর সার্বজনীন পূজায় উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর হিন্দুই যোগদান করতে পারে। এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর পূজায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্থায়ী বেদিতে পট আঁকা মূর্তিতে পূজা হয়।

কুব্জিকাতন্ত্রে বর্ধমান তথা রাঢ়ে ডাকার্ণবের নয়টি পীঠের উল্লেখ আছে।

১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি”র প্রথম খণ্ডের লেখক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

পুরাণ ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ধমান জেলার অন্যান্য স্থানের উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ শতকে রচিত কুব্জিকাতন্ত্রে (৭ম পটল) বর্ধমান, অম্বিকা (অম্বিকা কালনা), ক্ষীরগ্রাম, অট্টহাস, (এই নামে দুটি পীঠস্থান বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় অবস্থিত) প্রভৃতি সিদ্ধপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, বৃহন্নীলতন্ত্র, গান্ধর্বতন্ত্র, তন্ত্রসার, তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতে ক্ষীরগ্রাম, কেতুগ্রাম ও উজানী প্রভৃতি শাক্তপীঠের উল্লেখ এতদঞ্চলে শাক্ত ধর্মের প্রসার তথা তন্ত্রচারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “বর্ধমান পরিক্রমার” লেখক সুধীর চন্দ্র দাঁ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত–

বর্ধমান রাজ্যের পীঠস্থান মন্দির নির্মাণ ও দেবদেবী পূজার ব্যয় নির্বাহার্থে বিস্তর জমি দান করেন– যেমন–

১) উজানী–গুসকরা ষ্টেশন থেকে ৫ ক্রোশ দূরে কোগ্রামের কাছে দেবীর কনুই পতিত হয়েছিল। তথায় মঙ্গলচণ্ডী ও কপিলাম্বর ভৈরব বিরাজমান আছেন।

২) বহুলা–কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কেতুগ্রামে দেবীর বামবাহু পতিত হইয়াছে। এখানে দেবী বহুলা ও ভীরুক ভৈরব বর্তমান আছেন।

৩) কাঞ্চিদেশ–বোলপুর ষ্টেশনের দু-ক্রোশ দূরে কোপাই নদীর তীরে দেবীর কঙ্কাল পতিত হইয়াছিল। এখানে দেবী বেদগর্ভা ও রুরুভৈরব বর্তমান।

৪) ক্ষীরগ্রাম–মঙ্গলকোট থানার ক্ষীরগ্রামে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়। এখানে দেবী যোগাদ্যা ও ক্ষীরকণ্ঠক ভৈরব বিরাজমান।

BANGLADARSHAN.COM

১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি” দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

তাম্রাশ্মীয় যুগের মাতৃমূর্তি ও শিবলিঙ্গের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ নাই। সম্ভবতঃ পুরুষ ও প্রকৃতির পূজা পদ্ধতিতে এটিই প্রথম মূর্তিশিল্পের বিকাশ। কেতুগ্রাম, ক্ষীরগ্রাম, কাঞ্চননগর, কালনা, বর্ধমান, কল্যানেশ্বরী, উজানী, শ্রীখণ্ড, বিলেশ্বর, উদ্ধারণপুর, সিঙ্গি, মানকর প্রভৃতি স্থানে গুহ্যভাবে তান্ত্রিক সাধনার পরিচয় মেলে। তবে কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে পঞ্চমুণ্ডির আসনে তন্ত্রসাধনার নিমিত্ত আজও সাধকগণের আগমন ঘটে।

কুব্জিকাতন্ত্র মতে বর্ধমান, অম্বিকা, ক্ষীরগ্রাম সিদ্ধপীঠরূপে প্রসিদ্ধ এবং মধ্যযুগের প্রথমভাগে রচিত তন্ত্রশাস্ত্র মতে ক্ষীরগ্রাম ও বহুলা (কেতুগ্রাম) শাক্তপীঠের মর্যাদা লাভ করেছে।

২০১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বর্ধমান ইতিহাস সন্ধানে"র লেখকদ্বয় জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও গিরিধারী সরকার মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

পশুপালক সমাজে পশুপতি শিবের উপাসনা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিবের সঙ্গে শক্তিও উপাসিতা হতেন। প্রাচীনকালের তথা আদি মধ্যযুগের দেবীমূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন– অট্টহাসের প্রাপ্ত দন্তরা মূর্তি, কুড়মুনে প্রাপ্ত ইন্দ্রানী মূর্তি। এছাড়া অধিকাংশ দেবীমূর্তির সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী অর্থাৎ মধ্যযুগের।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ধমান জেলার মধ্যে কয়েকটি শক্তিপীঠ আবিষ্কৃত আছে যেমন–বহুলা, উজানী, যোগাদ্যা।

১) বহুলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বহুলা।

২) উজানীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মঙ্গলা।

৩) যোগাদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম যোগাদ্যা।

মনে হয় এই সব শাক্তপীঠকে কেন্দ্র করে কৌল মতের তান্ত্রিক সাধনা একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল।

২০০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি"র লেখক এককড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

BANGLADARSHAN.COM

॥বিভিন্ন ধর্ম ও দেবদেবী–শাক্তধর্ম ও শাক্ত সম্প্রদায়॥

কষ্টি পাথরে ক্ষোদিত দেবীর দশভূজা দুর্গামূর্তি। ক্ষীরগ্রামের পশ্চিমে ঢেকুর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দিককারী। দশভূজা দুর্গামূর্তি।

কেতুগ্রামে বহুলা মহাপীঠ, এখানে দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক। কার্তিক গণেশ সহ দেবী দুর্গামূর্তি।

২০০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "ভারত ভ্রমণে"র লেখক বারিদ বরণ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

কাটোয়া–কাটোয়া থেকে বাসে চড়ে ১৬ কিলোমিটার গিয়ে অজয় নদের তীরে কেতুগ্রাম। একেও অনেকে অন্যতম শক্তিপীঠ বলে দাবি করেন এবং বলেন দেবীর বামবাহু এখানে পড়িয়াছিল। দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক।

১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি"র তৃতীয় খণ্ডের লেখক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেক করা হইল–

আবার ষষ্ঠ শতকে রচিত কুব্জিকাতন্ত্রে (৭ম পটল) বর্ধমান, অম্বিকা ও ক্ষীরগ্রাম নাম সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে।

মহাপীঠ নিরুপনম গ্রন্থে বহুলাপীঠ (কেতুগ্রাম) ও বৃহদ্ধম পুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র মঙ্গলকোটের উল্লেখ আছে।

কেতুগ্রাম–কাটোয়া হতে সরাসরি বাসে ৪৫ মিনিট সময় কাটাতে পারলে কেতুগ্রাম থানার সদর কার্যালয়ে পৌঁছান যায়। বহুলা মহাপীঠের অবস্থিতির জন্য শাক্তপীঠ কেতুগ্রামের খ্যাতি বহুকালের। অতীতে এই গ্রামের নাম ছিল বহুলাপুর বা বহুলাপীঠ। তবে সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব পদকর্তা রামগোপাল দাস গ্রামের নাম 'কেতুগ্রাম' বলে উল্লেখ করেছেন। কেতুগ্রামের পট্টীবহুলাপুর বহুলা দেবী একটি মন্দিরের মধ্যে আছেন। তন্ত্রচূড়ামণি মতে সতীর বামবাহু এই স্থানে পতিত হওয়ায় শাক্তপীঠ বহুলায় তিনি বহুলা দেবী নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চ অতি সুন্দর মূর্তি, যা দেখলে চক্ষু সার্থক হয়। দেবীর ডান পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে শক্তিধর। কিন্তু মূর্তিটি সর্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকে।

কেতুগ্রামে প্রাপ্ত অষ্টভূজা গণেশ মূর্তি প্রাচীন ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য অবদান।

৩২। নৃত্যরত গণেশ মূর্তি ঃ কেতুগ্রাম

৩৩। বহুলাদেবী ঃ কেতুগ্রাম

২০০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বর্ধমান সমগ্রহের" প্রথম খণ্ডের লেখক ডঃ গোপীকান্ত কোঙার মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও গ্রাম্যদেবী খণ্ডেশ্বরীর কথা আজ সবাই জানে, আজও শ্রীখণ্ডের পাশাপাশি স্থান তান্ত্রিক পীঠস্থানও রয়েছে। কেতুগ্রামে বহুলাদেবীর মন্দির, মাঝিগ্রামে দেউলেশ্বর শিব ও শাকম্ভরী দেবী।

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "লোকায়ত মুর্শিদাবাদে"র লেখক পুলকেন্দু সিংহ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

উত্তর রাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্মের একটি বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল মনে হয়। তন্ত্রবর্ণিত একান্ন মহাপীঠের মধ্যে অন্যুন সাতটি মহাপীঠ কান্দীর ১৫/১৬ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত।

কিরিটেশ্বরী, বহুলা (কেতুগ্রাম), নলহাটি, খড়গ্রাম, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর প্রভৃতি।

BANGLADARSHAN.COM

॥সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥অষ্টম অধ্যায়॥

১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “সাহিত্য-পরিষৎ” পত্রিকার পত্রিকাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম. পি. এইচ.ডি-এর দ্বাবিংশ ভাগ–প্রথম সংখ্যা হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

-:বর্দ্ধমানের পুরাকতা:-

বর্ত্তমান সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির উৎসাহে গত ৬ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

কাটোয়া, দাঁইহাট, জগদানন্দপুর, অগ্রদ্বীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, বিল্বেশ্বর, কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্টহাস।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু

কেতুগ্রাম:- কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। বহুলা এই গ্রাম মধ্যেই ছিলেন, তাঁহারই দেবসেবার জন্য বহুলাপুর, তাঁহার নাম হইতেই কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই স্থানের নাম ‘বহুলা’ এবং এখানে ভগবতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপীঠ মধ্যে ধরা হইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাঁহার বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ যে বহুদিনের পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

BANGLADARSHAN.COM

বহুলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাণ উচ্চতায় ৩ ফুট, কষ্টিপাথরের অতি সুন্দর মূর্ত্তি–দেখিলে নয়ন-মন-মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে শক্তিধর। মূল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই কাপড়ে ঢাকা থাকেন। বহু অনুরোধের পর মূল মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার সময় পুরোহিত মহাশয় এককালে কাপড় সরাইতে রাজী হইলেন না।

এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির ধ্যান–

“ধ্যায়েচ্ছ্রী বহুলাং নগেন্দ্র তনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম।
দৌর্ভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয় যুতাং (ত্রিনয়নাং) বামে স্বপুত্রান্বিতাম॥
গৌরাঙ্গীং মণিহারকণ্ঠনমিতাং চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম্॥”

অর্থ–হিমালয়সুতা পদ্মাসনস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করিবে। তাঁহার চারি হাতের মধ্যে এক হাতে কাঁকুই, অপর দুই হাতে বর ও অভয়, বাম পার্শ্বে নিজ পুত্র। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত কণ্ঠ, আনন্দময়ী, কামদাকে চিন্তা করিবে।

এই ধ্যানের মাত্র তিনটী চরণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্যানে তিনটী হস্তের বর্ণনা আছে, বাকি চতুর্থ হস্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্ত্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, ‘বামে স্বপুত্রান্বিতাম।’ কিন্তু পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মূর্ত্তির এক পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় ও এক পার্শ্বে গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটী পাওয়া গেলে

এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ ধ্যানেই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে এই ধ্যান মন্ত্রটির তিনটী চরণ আছে, কেতুগ্রাম (বহুলাপুর) উক্ত পত্রিকায় লেখা আছে, বহুলা দেবীর ধ্যানের তিনটী চরণের ক্ষেত্রে চারটী চরণ হইবে তাহা উল্লেখ করা হইল। যেমন–

“ধ্যায়েচ্ছ্রী বহুলাং নগেন্দ্র তনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম।
দৌভি কঙ্কতিতাং বরাভয় যুতাং দর্শান্বিতাং শোভিতাম॥
নিদ্রাবেশ বসাঞ্চিতাং ত্রিনয়নাং বাগযুক্ত পুত্রান্বিতাম্।
গৌরাঙ্গীং মণিহারকণ্ঠ নমিতাং চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম॥”

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের তোলা ছবি এস্থলে দেওয়া হইল–

৮। কেতুগ্রামের বহুলাক্ষী।

বহুলা দেবীর ছবিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বহুলা দেবী তিনটী স্তবকের (অর্থাৎ পদ্মের) উপরে যে স্তবকটী আছে ঐ খানে শিবের লিঙ্গ দেখা যাইতেছে। মনে হয় যে বহুলা দেবী উক্ত লিঙ্গের উপর দণ্ডায়মানা। বহুলা দেবীর চারটী হাত, তার মধ্যে কালাপাহারের নির্মম অত্যাচারের কথা সকলেই জানেন, নীচের দুটি হাত কাটিয়া দিয়াছে। মনে হয় এটি যুগ্মমূর্ত্তি।

বিশ্বকোষ, শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রকাশিত পুস্তকের নবম ভাগ (দ: বর্ণ) হইতে দক্ষের স্থানে লেখা আছে যে (গরুড় পুরাণ-৫/৬ অধ্যায় দেখুন) ও (কালিকা পুরাণের ৮ম অধ্যায় হইতে ১৮ অধ্যায় দেখুন) এবং (শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণ ৪/১-৫ অধ্যায় দেখুন) তাহা হইলে সকল বিষয় জানিতে পরা যাইবে।

১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিশ্বকোষ, শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রকাশিত একবিংশ ভাগ (স, বর্ণ) হইতে সতীর স্থানে লেখা আছে যে (কালিকা পুরাণ–১০ম অধ্যায় হইতে ২৪ অধ্যায় ও ৪১ অধ্যায় হইতে ৪৫ অধ্যায় দেখুন) এবং (শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণ ৪/১-৫ অধ্যায় দেখুন) তাহা হইলে সকল বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “ভ্রমণ সঙ্গীর” লেখক গীতা দত্ত ও মৃণাল দত্তের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

বহুলা–কেতুগ্রামে বহুলা দেবীর মন্দির। দেবীর বামবাহু পড়ে বহুলায়। বিরল ভাস্কর্যের দেবী এখানে বহুলারূপী কিরীটধারী, স্তিমিত নেত্রা, ত্রিনয়নী, চতুর্ভূজী দুর্গা। তবে দেবীর বামহাতটি (এস্থলে হইবে দেবীর নীচের দুই হাত) কালাপাহাড়ের রোষে খণ্ডিত। দেবীর বাঁয়ে (এটি হবে ডান দিকে) কষ্টি পাথরের অষ্টভূজ গণেশ। অতীতে দেবীর নামে গ্রামের নাম ছিল বহুলা।

BANGLADARSHAN.COM

২০০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি”র লেখক ডঃ ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

-:শ্রীখণ্ডের চারিপাশে তান্ত্রিক পীঠস্থান:-

এখনও শ্রীখণ্ডের চারপাশের গ্রামগুলি পরিক্রমা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এক সময় এ অঞ্চলে তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলা, উজানির মঙ্গলচণ্ডী–এ সবই তান্ত্রিক দেবী এবং গ্রামগুলি প্রাচীন তান্ত্রিক পীঠস্থান।

২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা”র লেখক বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

ইন্দ্রাণী নিকটবর্তী রাজ্য বহুলাপুর বা বহুলাপীঠ (বর্তমান কেতুগ্রাম) হল এতদঞ্চলের শাক্তপীঠস্থান। সতীর বামবাহু এখানে পতিত হয়েছিল। বহুলাপুরের চণ্ডী হলেন বহুলাক্ষী (বহুলা) দেবী।

২০১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “ভারত তীর্থ” সমগ্রের লেখক পৃথ্বীরাজ সেন মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

বর্ধমানের বহুলাতে আছে অন্যতম শক্তিপীঠ। বিশিষ্ঠ ঐতিহাসিক নগেন্দ্র নাথ বসু তাঁর ‘বর্ধমানের ইতিকথা’ শীর্ষক গ্রন্থে এই সতীপীঠ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এক সময় কেতুগ্রাম বহুলা নামে পরিচিত ছিল। এই গ্রামেই আছে দেবী বহুলার মন্দির। তার ভগ্ন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এক সময়ে এখানে অতি প্রাচীন মন্দির ছিল। এখানে দেবী বহুলা প্রতিষ্ঠিতা। বহুলা দেবীর মন্দিরে ভৈরব হলেন ভীরুক, কিন্তু ভৈরব এখানে অনুপস্থিত। স্থানীয় বাসিন্দারা এবং পুরোহিত বলে থাকেন, ভৈরব ভীরুক দেবীর দেহে অন্তরীন। এমন বিগ্রহ অন্য কোনো শাক্তপীঠে দেখতে পাওয়া যায় না। বহুলার পীঠকাহিনীতে বলা হয়েছে, দেবীর বিগ্রহ খুবই প্রাচীন কালো পাথরের (কষ্টি পাথরের) ওপর খোদাই করা বিগ্রহ। দেবী চতুর্ভূজা ও তাঁর শরীর বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। মুখমণ্ডল ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। দেবীর চার হাতের এক হাতে কঙ্ক অর্থাৎ চুরুনি, অন্য দুই হাতে তিনি বর এবং অভয় প্রদান করছেন।

এখন একটি নূতন মন্দির তৈরী হয়েছে। এখানে দেবীমূর্তির পাশে অষ্টভূজ কষ্টি পাথরের গণেশ বিরাজমান (পূর্বেও গণেশমূর্তি ছিল)।

বহুলা শব্দের অর্থ কী? বাহু অর্থাৎ হাত দ্বারা যা বহন করা হয়। আমাদের এই শরীরে প্রাণসত্তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রাণই হলেন শিব আর দেবী হলেন শক্তি। এই প্রাণ আর শক্তি একত্রে মিলেমিশে আছে বলে আমরা কর্মচঞ্চলতার মধ্যে থাকতে পারি। শক্তির বিনাশে প্রাণ, আবার প্রাণের বিনাশে শক্তি কোনো কাজ করতে সমর্থ হয় না। এদের একত্রীকরণের ফলেই কর্মের উৎপত্তি হয়, সৃষ্টির সূচনা হয়।

BANGLADARSHAN.COM

২০০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “বঙ্গের শাক্তপীঠ ও সাধনক্ষেত্রে”র লেখক শিব শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় কেতুগ্রাম খুবই বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্তমানে কেতুগ্রাম দুটি ব্লকে বিভক্ত। কাটোয়া-বহরমপুর বাসে, মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের নামে সৃষ্ট কাশীরাম দাস সেতু অতিক্রম করে এখানে পৌঁছুতে বড় জোর আধঘণ্টা সময় লাগে। একান্নপীঠের অন্যতম পীঠস্থান বহুলা এই গ্রামেই অবস্থিত। পুরাণ অনুযায়ী বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে দেবীর বাম বাহু এখানেই পড়েছিল বলে দেবী এখানে ‘বহুলা’ নামে খ্যাত এবং পূর্বে গ্রামটিও বহুলা নামেই খ্যাত ছিল। বিভিন্ন পুরাণ, তন্ত্রগ্রন্থ ও কাব্যকাহিনীতে এই গ্রাম বহুলা নামে যে পরিচিত তার প্রমাণ হিসাবে প্রাণতোষিণী তন্ত্রের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে–

“বহুলায়াং বামবাহু বহুলাখ্যাচ দেবতা।
ভীরুক ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক॥”

“বহুলায় বামবাহু ফেলিল কেশব
বহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥”

পরবর্তী কালে মঙ্গলকাব্যে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যেও আছে।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দেবী যেখানে অধিষ্ঠিতা ছিলেন সেই গ্রামের নাম পূর্বে বহুলাই ছিল।

দেবী বহুলা খুবই প্রাচীন। হিন্দুদের দেবদেবীর ত্রাস কালাপাহাড়ের অনেক আগে ও যে দেবী বর্তমান ছিলেন এবং দেবীর উপর কালাপাহাড়ের নির্দয় হস্ত যে আঘাত হেনেছিল তার প্রমাণ দেবীর দেহে এখনও বর্তমান। দেবীর বাম বাহুটাই কাটা আছে। প্রায় সারা বছর কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে বলে সচরাচর নজরে পড়ে না।

বর্তমান মন্দিরটি নেহাতই সাদামাটা একতলা দালান। এটি ইংরাজীর ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এ তৈরী (উক্ত স্থানে বহুলা দেবীর প্রাচীন মন্দির ছিল, প্রাচীন মন্দিরটি ফাটিয়া ও ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য, পুনরায় উক্ত স্থানে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নূতন মন্দিরটি তৈরী হয়)। মন্দিরে তিন স্তবক বেদীর উপর দেবী বহুলা তথা চতুর্ভূজা দুর্গা মূর্তি বর্তমান। এটি উচ্চতায় প্রায় চার ফুটের উপর। ঘন কৃষ্ণ প্রস্তরে (কষ্টি পাথরে) নির্মিত, মুকুটধারী স্তিমিত নেত্রা, ত্রিনয়নী দেবীর এমন মনোমুগ্ধকর চতুর্ভূজা দুর্গা মূর্তিতে অবস্থান সত্যই বিরল। দেবীর মাথর উপরের চালির মধ্য অংশে শিবের মূর্তি, দুপাশে দুটি উড়ন্ত পরী, চালিতে অনেক লতাপাতা, তার নীচে দুদিকে দুটি হাতির মূর্তি।

দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা থাকলেও শারদীয়া দুর্গাপূজায় মহাধুমধামে চারদিন ধরে পূজা হয়ে থাকে। মহানবমীতে দেবীকে নতুন কাপড় পড়ানো হয়। ঐ দিন ছাগবলি ও মহিষবলি সহ দেবীর পূজা হয়ে থাকে। দেবীর ডানদিকে বেশ বড় সড় এক অষ্টভূজ গণেশ মূর্তি, তারও চালিতে উড়ন্ত দুই পরী যা পুরাকীর্তির এক প্রকৃষ্ট নমুনা। সাধারণত দেখা যায় প্রতিটি পীঠস্থানে ভিন্ন নামে দেবীর রক্ষক হিসাবে একজন ভৈরব থাকেন কিন্তু এখানে দেবীর ভৈরব নেই। সম্প্রতি মূলমন্দিরের দক্ষিণে এক সুবৃহৎ আটচালা, নির্মল চন্দ্র রায়ের দানে ১৪০০ সালে নির্মিত হয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

কতদিন ধরে দেবীর পূজা এখানে চলে আসছে তা আমাদের অজানা। এই গ্রামেই দেবীর পূজকদের অবস্থান, তাঁদেরই একজন শ্রীঅকুল চন্দ্র রায় (সেবাইত) জানালেন যে, তাঁরা একুশ পুরুষ ধরে দেবীর পূজা করে আসছেন এবং একুশ পুরুষের বংশ তালিকার হিসাবে (প্রতি পুরুষ ত্রিশ বছর) ৩০×২১=৬৩০ বছর ধরে বংশানুক্রমিক এঁরা দেবীর পূজা করে আসছেন এবং দেবীও অন্তত ছয়শ বছরের প্রাচীন।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "শক্তি পীঠের সাধকে"র লেখক শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

কেতুগ্রামের (প্রাচীন বহুলাপুর) সুপ্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ভগবৎ প্রেমিক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাকনাম মহাদেব) মহাশয়ের পুত্র মহাসাধক স্বীভৃগুরাম বিদ্যাবাগীশ। তিনি তিকু বা ত্রিবিক্রম নামেও পরিচিত ছিলেন। শৈশব হইতেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। অতি অল্প সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। বীরভূম জেলার বহুলা গ্রামের আগমবাগীশ বংশের এক বৈদান্তিক পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার নিকট

"তারা" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মাত্র ২০/২১ বৎসর বয়সে আহমদপুর কাটোয়া লাইনের চার মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রামে মহাসাধক শক্তি সাধনায় লিপ্ত হন। এই স্থানের নাম বহুলাপুর হইতে কেতুগ্রাম হয়। এখানে সতীদেবীর বাম হস্ত পড়িয়াছিল। বহুলাপুর (বর্তমান কেতুগ্রাম) বহুলক্ষ্মী মূর্তি কষ্টি পাথরে নির্মিত, উহার ভাস্কর্য অতি অপূর্ব।

বহুলাপীঠ সম্বন্ধে "শিবচরিত" গ্রন্থে বর্ণনা আছে। তাহাতে দেখা যায় রাঢ় দেশের অন্তর্গত ইন্দ্রাণীর নিকটবর্তী রাজ্য বহুলাপুর এর বহুলাদেবী পীঠস্থান অবস্থিত। এই মহাপীঠে সাধক ভৃগুরাম সাধনা করিবার সময় প্রত্যাদেশ পাইয়া বেলুনের (বর্তমান বড়বেলুন) মহাশ্মশানে গমন করেন।

বেলুনের মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করিয়া বহুলাপুর হইতে আনীত এক প্রস্তরমূর্তি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ভৃগুরাম স্বামী জরতি মূর্তির তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন।

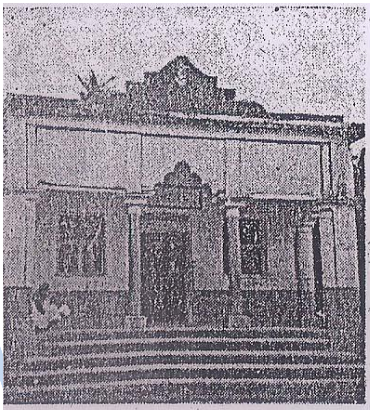

কেতুগ্রামের মধ্যে অবস্থিত বহুলা দেবীর মন্দীর। ফটো—শ্রীবিপদ তারণ পাঁজা

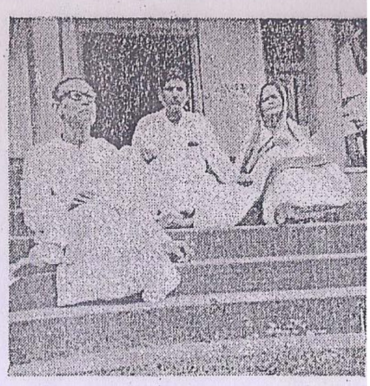

মন্দীর প্রাঙ্গনে উপবিষ্ট (ডান হইতে) গুরুমাতাঅনিমা দেবী গুরুদেবশ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও লেখকশ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "সতীপীঠ পরিক্রমা"র প্রথম খণ্ডের লেখক অমিয় কুমার মজুমদার মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

কেতুগ্রামে দেবী বহুলা–পীঠনির্ণয়ের দ্বাদশতম পীঠ হলো বহুলায়। বর্ধমানের অন্তঃপাতী কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম বহুলা। পীঠের বর্ণনা আছে এইভাবে–

"বহুলায়াং বাম বাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো দেবতা স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"

পীঠের নাম বহুলা। এখানে সতীর বাম বাহু পতিত হয়েছে। পীঠ দেবীর নাম বহুলা এবং ভৈরব হচ্ছেন ভীরুক। ইনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা।

এ সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র লিখেছেন–

"বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥"

অন্নদামঙ্গলে বহুলা স্থানে বাহুলা লেখা হয়েছে এবং পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বাহুলা চণ্ডিকা বলা হইয়াছে।

ওখানে গিয়ে দেখতে পাবেন প্রায় নতুন একটি মন্দির। সমতল ছাদ, মন্দির ছোট। কালো পাথরে (কষ্টি পাথরে) তৈরী দেবীমূর্তি সুদৃশ্য এক (তিন স্তবক) পীঠের উপর দণ্ডায়মানা। দেবী চতুর্ভূজা। মাথায় কিরীট বা মুকুট আছে। পিছন দিকে কারুকার্য করা চালচিত্র। ডানদিকে গণেশ, বাঁ দিকে লক্ষ্মী। সুন্দর দেবী মূর্তির ডান দিকের হাত ভাঙ্গা। তবে মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা থাকে।

নিত্য সেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুর্গাপূজার সময় এখানে যে পূজা হয় সেটিই বড়ো। তখন ছাগ ও মহিষ বলিদান হয়। দেবীর ডানদিকে গণেশ আছেন পূর্বেই বলেছি। বিশেষত্ব হলো মূর্তিটি অষ্টভূজ।

তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতের মতে এই স্থানের নাম 'বহুলা' এবং এখানে সতীর বামবাহু পড়ায় এই স্থান মহাপীঠ বলে গণ্য হয়েছে। বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ নগেন্দ্র নাথ বসু তাঁর 'বর্ধমানের ইতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন, বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাঁহার বর্তমান মন্দিরের পুষকরিণীর ঘাটে যে সকল পুরাতন কাটা পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

BANGLADARSHAN.COM

বহুলা দেবীর উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন হাত। কালো (কষ্টিপাথর) পাথরে গড়া। মূর্তিটি সুন্দর। আগেই বলা হয়েছে মূর্তিটি কাপড়ে ঢাকা থাকেন।

দেবীর ধ্যান মন্ত্র–

"ধ্যায়েচ্ছ্রী বহুলাং নগেন্দ্র তনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম।
দৌভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয় যুতাং (ত্রিনয়নাং) বামে স্বপুত্রান্বিতাম॥
গৌরাঙ্গীং মণিহারকণ্ঠ নমিতাং চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম॥"

হিমালয়সুতা পদ্মাসনাস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করবে। তাঁর চার হাতের মধ্যে এক হাতে কাঁকুই, অন্য দুই হাতে বর ও অভয়, বাম পার্শ্বে নিজ পুত্র। গৌরাঙ্গী মণিহার দ্বারা নমিত কণ্ঠ, আনন্দময়ী কামদাকে চিন্তা করবে।

এই ধ্যানের মাত্র তিনটি চরণ পাওয়া গেছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা–কাটোয়া আহমদপুর রেলপথে দশমাইল দূরে নিরোল স্টেশনে নেমে প্রায় একমাইল দক্ষিণে কেতুগ্রাম, যার প্রাচীন নাম বহুলা। অজয় নদের উপর কাশীরাম দাস সেতু হওয়াতে কাটোয়া থেকে কেতুগ্রামের দূরত্ব মাত্র সতেরো কিলোমিটার। কেতুগ্রামের মোড় থেকে সাইকেল রিক্সায় পীঠস্থানে যাওয়া যায়। এই পীঠ থেকে সব চেয়ে কাছের রেলস্টেশন হলো কাটোয়া আহমদপুর শাখার অম্বলগ্রাম। ট্রেন যদি না

ধরতে চান বাসও আছে। আবার কাটোয়া থেকে তেরো কিমি দূরে পাঁচুণ্ডী স্টেশনে নেমে পাঁচ মিনিট গেলেই পীচঢালা রাস্তা। সেখান থেকে সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায়।

২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "শক্তিপীঠ পরিক্রমা"র লেখক গৌতম বিশ্বাস মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

কেতুগ্রামের বহুলাদেবী–পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রামে বহুলা পীঠ আছে। পীঠনির্ণয় তন্ত্র মতে–

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো দেবতা স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"

অর্থাৎ–বেহুলা বা বহুলায় দেবীর বাম বাহু পতিত হয়েছিল। দেবীর নাম বহুলা। তাঁর ভৈরব হলেন ভীরুক।

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই পীঠ সম্বন্ধে বলেছেন–

"বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥"

ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে পীঠনির্ণয়তন্ত্র মতকেই সমর্থন করেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

সকাল এগারোটা নাগাদ মন্দির দ্বারে পৌঁছিলাম। পাশের জলাধার থেকে আচমন করে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মায়ের সেবাইত ততক্ষণে মায়ের পূজা শুরু করেছেন। রক্ত জবা দিয়ে মাকে সাজাবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃবন্দনা করছেন–

"ধ্যায়েচ্ছ্রী বহুলাং নগেন্দ্র তনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম।
দৌর্ভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয় যুতাং বামে স্বপুত্রদ্বিতাম॥"

এখানে মাত্র ধ্যানের দুটি চরণ উল্লেখ করেছেন (বাকী আরও দুটি, মোট চারটি) চরণ উল্লেখ করেন নাই, হয়ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

এই বন্দনার মধ্যেই দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্ভূজা দেবীর চার হাতের মধ্যে এক হাতে কাঁকুই, অন্য হাতে ভক্তগণকে বর এবং অভয় দান করছেন। তবে দেবীর মুখ ছাড়া সমস্ত দেহই কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত থাকার জন্য তিনি দণ্ডায়মানা না উপবিষ্টা তা বুঝতে পারলাম না।

বহুলা দেবী তিন থাক পীঠের উপর দণ্ডায়মানা এবং তৃতীয় যে থাকটি আছে, দেবীর বাম দিকের ঐ স্থানে শিব লিঙ্গের চিহ্ন বা শিবলিঙ্গ বুঝিতে পারা যায়, উক্ত শিব-লিঙ্গ দেখিলে বুঝিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না যে দেব ও দেবী (যুগ্মমূর্তি) উভয়ে উক্ত মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন।

পূজান্তে মায়ের প্রসাদি এবং আশীর্বাদ মাথায় ঠেকিয়া মন্দিরের ইতিহাস খোঁজায় মন দিলাম। এই অঞ্চলে যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধ এই তিন ধর্মের মেল বন্ধন খুঁজে পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি বর্তমান

নতুন মন্দিরে প্রাচীন কালো পাথরের (কষ্টি পাথর) দেবীমূর্তিকে রেখে নতুনে পুরাতনে যেন আর এক মেল বন্ধন রচিত হয়েছে।

এইখানে কিছু তথ্য জানা দরকার যে, প্রাচীনকালে এই গ্রামের নাম ছিল বহুলা, বহুলাদেবীর নামানুসারে ও দেবী নামে 'লাট বহুলাপুর' জমিদারীও ছিল। অতীতে কেতুগ্রাম ও কেতুগ্রাম পুলিশ স্টেশন বীরভূম জেলার অধীনে ছিল। ইংরাজীর ১৮৫৯ সালে কেতুগ্রাম ও কেতুগ্রাম পুলিশ স্টেশন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়। উক্ত সময় হইতে কেতুগ্রাম ও কেতুগ্রাম পুলিশ স্টেশন এবং কেতুগ্রামের বহুলা দেবী বর্দ্ধমান জেলাস্থিত হিসাবে গণ্য হইয়াছে।

১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "সতীর দেহচ্ছেদ একান্নপীঠে"র লেখিকা পূর্বা সেনগুপ্তের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

কেতুগ্রাম–বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও তন্ত্রের প্রভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে বর্ধমানের সংস্কৃতি। এই বর্ধমানেই দেবীর দ্বাদশ পীঠ, এই জেলায় কাটোয়া শহরের কাছে প্রাচীন স্থান কেতুগ্রাম। পুরাতনকালে কেতুগ্রামের নাম ছিল বেহুলা বা বহুলা, পীঠনির্ণয়তন্ত্রের মতে এই বহুলাতে দেবীর বাম বাহু পতিত হয়েছিল। এখানে বলা হয়–

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো দেবতা স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"

বহুলায় দেবীর বাম বাহু পতিত হয়েছিল। পীঠ দেবীর নাম বহুলা ও ভৈরব হলেন ভীরুক। কেতুগ্রামের দেবী সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না।

BANGLADARSHAN.COM

অন্নদামঙ্গলে এই পীঠস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে–

"বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥"

ভারতচন্দ্রের ভাষায় বাহুলা চণ্ডিকা দেবীকে পীঠমালাতন্ত্রে পীঠস্থান বলা হলেও প্রাচীন অনেক তন্ত্রে এই পীঠের কথা আমরা পাই না, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র ইত্যাদিকে এই স্থানের উল্লেখ করা হয়নি। আবার বৃহন্নীলতন্ত্রের মধ্যে এই স্থানের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করা হয়েছে। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিতেও বলা হয়েছে এই স্থানে সতীর বাম বাহু পতিত হয়েছিল।

কালো (কষ্টি পাথরে) পাথেরর উপর খোদাই করা বিগ্রহের পিছনে তিনকোন ভাবে চালচিত্র নেমে এসেছে। দেবীর মাথায় মুকুর রয়েছে, দেবী চতুর্ভূজা, তবে তার একদিকের হাত ভাঙ্গা। দেবীমূর্তির মধ্যে সব থেকে চোখে পড়ার মতো ক্ষেত্রটি হল দেবীর কাপড় পরবার রীতি। বিগ্রহের গলার দুইপাশ দিয়ে শাড়িকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এর ফলে একমাত্র দেবীর মুখ ছাড়া সমগ্র দেহের কোনও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। দেবীর ডান দিকে অষ্টভূজা গণেশ এবং বাঁদিকে লক্ষ্মী দেবী।

প্রায় সাড়ে তিনহাত উঁচু মূর্তিটি। ধ্যান মন্ত্র হল–

"ধ্যায়েচ্ছ্রী বহুলাং নগেন্দ্র তনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম।
দৌভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয় যুতাং বামে স্বপুত্রান্বিতাম॥
গৌরাঙ্গীং মণিহারকণ্ঠ নমিতাং চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম॥"

হিমালয় সুতা পদ্মাসনে উপবিষ্টা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করবে, তবে চার হাতের মধ্যে এক হাতে কাঁকুই, অন্য দুই হাতে বর ও অভয়। বাম পাশে নিজ পুত্র। গৌরাঙ্গী মণিহার দ্বারা নমিত কণ্ঠ, আনন্দময়ী কামদাকে চিন্তা করবে। এখানে উল্লেখ্য যে ধ্যান মন্ত্রের কেবল তিনটি চরণ পাওয়া গিয়াছে। মধ্যেখানে নিশ্চয় আর একটি চরণ ছিল। কিন্তু কালের গতিপথে বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে পুরোহিতগণ এই অসম্পূর্ণ ধ্যান মন্ত্র দিয়েই পূজা সম্পন্ন করেন (অমিয় মজুমদারের 'সতীপীঠ পরিক্রমা' প্রথম খণ্ড অনুযায়ী)।

বহুলা দেবীর নামে জমিদারী ছিল, তাহার নাম হচ্ছে 'লাট বহুলাপুর জমিদার', উক্ত জমিদারদের পদবী হচ্ছে 'রায়।' বহুলা দেবীর মন্দির কে বা কারা তৈরী করিয়াছিল তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

তান্ত্রোক্ত একান্ন পীঠের ৫টি ও ৪টি উপপীঠ এই প্রদেশেই বর্তমান। সেই পাঁচটি মহাপীঠ–

১) অট্টহাসের ফুল্লরা দেবী ও বিশ্বেশ ভৈরব।
২) নলহাটীতে কালিকা দেবী ও যোগীশ ভৈরব।
৩) বহুলা বা কেতুগ্রামে বহুলাদেবী ও ভীরুক ভৈরব।
৪) ক্ষীরগ্রামে যুগাদ্যাদেবী ও ক্ষীরক ভৈরব।
৫) বক্রেশ্বর মহিষমর্দ্দিনী দেবী ও বক্রনাথ ভৈরব।

চারটি উপপীঠ–

১) কিরীট গ্রামে বিমলাদেবী ও সম্বন্ধ ভৈরব।
২) নন্দিগ্রামে নন্দিনীদেবী ও নন্দিকেশ্বর ভৈরব।
৩) দ্বারকানদীর পূর্বতীরস্থ তারাদেবী।
৪) কনকপুরের অপরাজিতাদেবী।

সেনরাজাগণের সময়ে এই সকল দেবী পূজিতা হইতেন। ইহাদের মন্দির ছিল।

সতীপীঠ সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেইসব গ্রন্থ দীনেশ চন্দ্র সরকারের গবেষণাগ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে যেতে পারেনি। অধ্যাপল সরতার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন, পীঠগুলির ইতিহাস আলোচনায় কেবল তাত্ত্বিক ও পৌরাণিক ক্ষেত্রটিকে তিনি তুলে ধরতে চাননি, পীঠতত্ত্বের প্রকৃত সত্যরূপটি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, এই পীঠসংক্রান্ত আলোচনায় তিনি পীঠনির্ণয় তন্ত্র বা মহাপীঠ নিরুপমতন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এই মহাপীঠ নির্ণয়ের গুরুত্ব সতীপীঠের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ কারণ নির্ণয়তন্ত্র অনুযায়ী অধ্যাপক সরকার সতীপীঠগুলির আলোচনা করেছেন এবং এই পীঠনির্ণয়ের তালিকা অনুযায়ীই অন্যান্য গবেষকগণ পীঠের তালিকা প্রামাণিক বলে চিহ্নিত করেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "গ্রাম বর্ধমানের দেবদেবী ও সংস্কৃতি"র লেখক মৃণালকান্তি চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে এই তথ্য উল্লেখ করা হইল–

বহুলা-পীঠস্থান–পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে সতীর দেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ৫১টি অংশ পৃথিবীর যে যে স্থানে পতিত হয়, সে সমস্ত স্থানই শক্তিপীঠ রূপে বিবেচিত হয়। তারই এক অংশ বহুলা দেবীর বাম বাহু পড়েছিল বলে 'বহুলা' ৫১ পীঠের একটি তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। বহুলা নামের তাৎপর্য বর্ণনায় বলা যায় পুরাণ ও কাব্যকাহিনীতে প্রমাণ হিসাবে প্রাণতোষিণী তন্ত্রের একটি শ্লোক উল্লেখ করা যায়–

"বহুলায়াং বামবাহুর্ব্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো দেবতা স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে আছে–

"বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥"

দেবী বহুলা খুবই প্রাচীন। হিন্দুদের দেবদেবীর উপর যে কালাপাহাড় আঘাত হেনেছিল তার প্রমাণ দেবীর দেহে আজও বর্তমান। দেবীর বাম বাহুর গোটা অংশই কাটা আছে।

যাতায়াতের ব্যবস্থা–এই স্থানটি শহর কাটোয়া হতে বেশ কাছাকাছি হওয়ায় দেবী দর্শনার্থীরা অনায়াসেই যাওয়া আসা করতে পারেন। প্রয়োজন বোধে কাটোয়া হতে যাওয়া আসা করার কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া নিবাসেও একরকম থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে বলা যায় কাটোয়া লাইনের মধ্যেই প্রথমে পরে ক্ষীরগ্রামে দেবী 'যোগাদ্যাদেবী' মায়ের পুণ্যতীর্থ ধাম, তারপর কাটোয়া হতে অল্প কিছু দূরেই আবার ৫১ পীঠেরই অন্যতম পীঠ 'বহুলাদেবী' মায়ের স্মৃতি বিজরিত তীর্থভূমি। জেলা বর্ধমানের তীর্থক্ষেত্র তথা মহামিলনের পুণ্যধাম মানব মনের গভীরে স্থান চির সমুজ্জ্বল চির অম্লান। মনের গভীরে বিরাজমান 'দেবী বহুলা ও দেবী যোগাদ্যা' ৫১ পীঠের মহাতীর্থ দর্শনার্থীদের খুব অল্প ব্যয়ে সাধ্য বলে মনে করি।

BANGLADARSHAN.COM

॥অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥নবম অধ্যায়॥

সতীপীঠ 'বহুলা' দেবীর মন্দিরে নাটমন্দির বা আটচালা নির্মাণের কাহিনী–

'বহুলা দেবী'র মন্দিরের চারিদিকের প্রাচীর ও তিনটি ঘরের কাজ ব্যাপকভাবে চলিতেছে। সেই সময় শ্রীশিব নারায়ণ রায় মহাশয় শ্রীঅসীম কুমার রায় কে বলিলেন যে, তুমি আমার ভাই লণ্ডন নিবাসী শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায়কে চিঠি দাও যে, 'বহুলা দেবী'র মন্দিরে নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণ করিয়া দিবার জন্য। শ্রীশিব নারায়ণ রায় মহাশয়ের কথামত শ্রীঅসীম কুমার রায় শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয়কে চিঠি লিখিলেন যে, 'বহুলা দেবী'র মন্দিরে নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণ করিয়া দিবার জন্য। চিঠি পাওয়ার পর শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয় নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণ করিয়া দিবার কথা শ্রীঅসীম কুমার রায়কে পত্র দ্বারা জানাইয়া ছিলেন।

তাহার পর শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয় সুদূর লণ্ডন হইতে আসিয়া কলকাতার দাদার (শ্রীদীনেশ চন্দ্র রায়) বাড়িতে সপরিবারে উঠিয়াছিলেন। তখন শ্রীদীনেশ চন্দ্র রায় সপরিবারে ভাই শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায়কে 'বহুলা দেবী'র মন্দিরে নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণ করিয়া দিবার কথা ভাইকে বলিয়াছিলেন, তখন শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয় বলেন, আমি 'বহুলা দেবী'র মন্দিরে নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণ করিয়া দিব।

ইহার পর ভাইপো শ্রীঅরুণ কুমার রায় স্ত্রীসহ এবং শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয়ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কেতুগ্রাম বাড়ি আসিয়াছিলেন, 'বহুলা দেবী'র মন্দিরে নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণ করিবার আলোচনা করিবার জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীঅসীম কুমার রায় শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, তখন শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয় অসীম রায়কে বলেন যে, তুমি আমাকে 'বহুলা দেবী'র মন্দিরে নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণ করিয়া দিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলে। অসীম রায় পত্র লিখিবার কথা স্বীকার করিলেন, তখন শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় অসীম রায়কে বলিলেন, অদ্য সন্ধ্যার সময় পাড়ার সকল ব্যাক্তিগণকে 'বহুলা দেবী'র মন্দির প্রাঙ্গণে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাও 'নাট মন্দির বা আটচালা' নির্মানের বিষয়ে আলোচনার জন্য। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় বহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে ১০০ (একশত) ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয় বহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া সকল ব্যক্তিগণের সামনে বলিলেন যে, শ্রীঅসীম কুমার রায়কে নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, আরও বলিলেন যে, নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণের ব্যাপারে শ্রীঅসীম কুমার রায়কে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না ও জানেন না। শ্রীঅসীম কুমার রায় সকল ব্যক্তিগণের সামনে বহুলা দেবীর নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার কথা স্বীকার করিলেন। শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয় বলিলেন, তিনি শ্রীঅসীম কুমার রায়ের নামে টাকা পাঠাইয়া দিবেন এবং সমস্ত কাজ শ্রীঅসীম কুমার রায় দেখাশুনা করিবেন। এই সকল কাজের জন্য শ্রীদীনেশ চন্দ্র রায় ও শ্রীশিব নারায়ণ রায় মহাশয়গণ সপরিবারে বহুলা

দেবীর নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণের জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন ও কেতুগ্রামের যুবকগণ শ্রীঅসীম কুমার রায়কে নানাভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন

এ স্থলে নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণের সময়কার ছবি দেওয়া হইল–

বেশ কিছু দিন পর শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয় লণ্ডন হইতে স্বপরিবারে কলিকাতা আসিয়াছিলেন এবং পরে কেতুগ্রাম বাড়ি আসিয়াছিলেন। শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয় কেতুগ্রাম বাড়ি আসিবার পর শ্রীঅসীম কুমার রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সকল বিষয় আলোচনা করিলেন। অসীম রায় নির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয়কে জানালেন যে, আপনি বা আপনার স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যে কেউ হোক কাউকে এই নাট মন্দির বা আটচালা উদ্বোধন করিতে হইবে।

১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর সকাল ৮ (আট) ঘটিকায় বহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে বণাঢ্য সহকারে শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী জিলিয়ান রায় মহাশয়া নাট মন্দির বা আটচালা উদ্বোধন করিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রামের দুইশত থেকে তিনশত মানুষ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাছাড়া ঐ অনুষ্ঠানে ভাগবত পাঠ ও নাম সংকীর্তন হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় ও শ্রীঅরূপ কুমার মুখোপাধ্যায় যৌথভাবে অর্থ দিয়া উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়াছিলেন। শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় ও ওনার স্ত্রী উভয়ে উপস্থিত সকল কেতুগ্রাম বাসীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

নাট মন্দির বা আটচালা নির্মাণের জন্য শ্রীঅসীম কুমার রায় ও কেতুগ্রামের যুবকগণের সহযোগিতা ও শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী পূজা পরিষদ এবং শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ডের যত্ন ও চেষ্টায় শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায় মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে উক্ত নাট মন্দির বা আটচালা নির্মিত হইল, বাংলার ১৪০০ সালে।

এ স্থলে নাট মন্দির বা আটচালা উদ্বোধনের ছবি দেওয়া হইল–

BANGLADARSHAN.COM

ইংরাজী ২৬/১২/১৯৬৮ তারিখ হইতে বহুলা দেবীর মন্দির ভাঙ্গা শুরু হইতে শ্রীমতী লক্ষ্মী রাণী রায় মহাশয়া স্বর্গলাভের পূর্বদিন অব্দি 'বহুলা' দেবীর গৃহাদি নির্মাণ ও উন্নতির কথা আন্তরিকভাবে চিন্তা ভাবনা করিতেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী রাণী রায় মহাশয়া স্বর্গলাভের পর 'বহুলা' দেবীর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ও সক্রীয় কর্মীর অভাব আমরা আজও অনুভব করিতেছি।

॥নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥

চলিবে।

BANGLADARSHAN.COM